সমুদ্র বিলাস

হুমায়ূন আহমেদ

সূচিপত্র

১. তৌহিদের কী যেন হল 2
২. সমস্যাটা কী বলুন তো 12
৩. কোনো কথা দ্বিতীয়বার বলতে 24
৪. জোবেদা খানম কোরান শরীফ পড়ছিলেন 57
৫. কক্সবাজার রওনা 66
৬. তারা কক্সবাজার পৌঁছল 80
৭. অনি ঘুমুচ্ছে 95
৮. চার নম্বর বিপদ-সংকেত 115

১. তৌহিদের কী যেন হল

রাত তিনটার দিকে তৌহিদের কী যেন হল। বুকে চাপ ব্যথা, ঠিকমতো নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। কী হচ্ছে? সে কি মরে যাচ্ছে? মৃত্যু কি এরকম হয়? তৌহিদ ক্ষীণ স্বরে ডাকল, রিমি, এই রিমিঃ।

রিমি এই বিছানায় তার সঙ্গেই ঘুময়। শুধু আজ ঘুমুয় নি। আজ দুপুরে দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড রকমের ঝগড়া হয়েছে। সেই ঝগড়ার পরিণতিতে রিমি ঘুমুচ্ছে বসার ঘরের সোফায়। মশারি খাটানো যায় নি। দুটি মসকুইটো কয়েল জ্বালানো হয়েছে। তার উৎকট গন্ধে মশাদের কিছুই হচ্ছে না, দম বন্ধ হয়ে আসছে রিমির। তার একবারেই ঘুম হচ্ছে না, বার-বার ইচ্ছে করছে শোবার ঘরে মশারির ভেতর চলে যেতে। যাওয়া যাচ্ছে না, ও ঘরে যাওয়া মানে পরাজয় স্বীকার করে নেয়া।

তৌহিদ আবার ডাকল, রিমি। এই রিমি তৌহিদের গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে রিমি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে বসল—তীক্ষ্ণ গলায় বলল, কী হয়েছে?

বাতি জ্বালাও, আমি মরে যাচ্ছি।

রিমির সব এলোমেলো হয়ে গেল। এই ঘরের সুইচ বোর্ডটা কোথায়? সে সোফার কোন দিকে মাথা দিয়েছে? জানালা যে দিকে, সেই দিকে? এত অন্ধকার কেন চারপাশের সোফা থেকে নামার সময় ধাক্কা লেগে টেবিলে রাখা গ্লাস ঝন শব্দে ভাঙল। পাশের ঘর থেকে রিমির শাশুড়ি জোবেদা খানম বললেন, ও বৌমা কী হয়েছে, হয়েছে কী?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ভাগ্যিস তিনি কথা বলছিলেন, তাঁর কথা শুনেই রিমি দিক ঠিক করল। সুইচবোর্ড খুজে পেল। বাতি জ্বালাল। জোবেদা খানম একনাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছেন, ও বৌমা কি ভাঙলঃ ঘরে চোর ঢুকল না-কি দেখা ভালো করে দেখা খাটের নিচটা দেখ।

রিমি তার শাশুড়ির কোনো কথার জবাব দিল না। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তৌহিদের দিকে, বোঝাই যাচ্ছে, এই মুহূর্তে শ্বাস নেয়ার পুরো প্রক্রিয়াটা তৌহিদের কাছে অত্যন্ত কষ্টকর। তার ঠোঁট কেমন নীলচে হয়ে গেছে। চোখ ঘোলাটে। তৌহিদ। বিড়বিড় করে বলল, জানালা খুলে দাও, ফ্যান ছাড়।

রিমি ফ্যান ছাড়ল। জানালা খুলল। হুক থেকে মশারি খুলে ফেলল যাতে তৌহিদ প্রচুর বাতাস পায়। রিমি কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, পানি খাবে? পানি এনে দেই?

না।

তৌহিদের নিঃশ্বাসের এই কষ্টটা অনেক পুরানো। সবসময় হয় না, মাঝে-মাঝে হয়। যখন হয়; বড় ধরনের নাড়া দিয়ে যায়। তবে কখনোই বেশিক্ষণ থাকে না। আজ বড় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আছে। এতক্ষণ থাকার কথা না।

পাশের ঘর থেকে জোবেদা খানম এখনো কথা বলে যাচ্ছেন, ও বৌমা, তোমরা কথা বললে জবাব দাও না কেন? চোর না-কি? চোর হলে একটা দা হাতে নিয়ে বের হও। খাটের তলা দেখেছ? এরা খাটের তলায় ঘাপটি মেরে থাকে।

রিমি বিরক্ত গলায় বলল, কিছু হয় নি মা। আপনার ছেলের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

খোকার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে?

হ্যাঁ।

তুমি একটু এদিকে শুনে যাও তত বৌমা।

বুড়ো মানুষরা বড় বেশি যন্ত্রণা দেয়। একটা মানুষ নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, ছটফট করছে আর তার শাশুড়ি শুধু বকবক করছেন।

ও বৌমা, তোমাকে বললাম এদিকে আসতে....

মা চুপ করে থাকুন। প্লিজ।

তৌহিদ বলল, কটা কমেছে। তুমি যাও শুনে এস।

কষ্টটা যে কমেছে এটা এখন বোঝা যাচ্ছে। মুখের ফ্যাকাসে ভাবটা চলে গেছে। চোখ পরিস্কার।

সত্যি-সত্যি কমেছে?

হ্যাঁ। তুমি যাও মাকে শান্ত করে আস।

রিমি বিরক্ত গলায় বলল, ও ঘরে গেলে মার সঙ্গে ঝগড়া হবে।

আহ্ যাও। বুড়ো মানুষ।

তোমার শ্বাসকষ্ট কমেছে?

হ্যাঁ, আমাকে এক কাপ কফি করে দাও। বলেই তৌহিদ মিষ্টি করে হাসল। যে কিছুক্ষণ আগেই ছটফট করছিল সে কী করে এত সুন্দর হাসে? আলাদা শোবার জন্যে রিমির নিজের উপর খুব রাগ লাগছে। কেন সে এটা করতে গেল? আর শ্বাসকষ্টটা বেছেবেছে আজকের দিনেইবা হল কেন? একদিন পরে হলেও তো নিজেকে এত অপরাধী মনে হত না।

রিমি, মা কি বলছে শুনে আস। রাগারাগি করবে না–প্লিজ।

রিমি শাশুড়ির ঘরে ঢুকল। বাতি জ্বালাল। জোবেদা খানম বিছানায় চুপচাপ বসে আছেন। তাঁর বয়স আশির কাছাকাছি। সেই তুলনায় শরীর খুব শক্ত। চোখে কম দেখেন তবে ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। রিমি ঘরে ঢোকামাত্রই বললেন, খোকার ব্যথা কমেছে?

হ্যাঁ।

সেটা আমাকে এসে বলে গেলে কি তোমার খুব কষ্ট হয়? আমার ঘরটা কি পাঁচ মাইল দূরে?

খামাখা ঝগড়া করবেন না মা। ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছে না।

ঝগড়া কে করেছে, আমি না তুমি? একটা কথা এক শবার জিজ্ঞাস করলে একবার জবাব পাওয়া যায়।

রাতদুপুরে চেঁচামেচি করবেন না তো মা। ঘুমুতে চেষ্টা করুন।

খোকার বুকে তেল মালিশ করে দাও। খোকার আরাম হবে।

ওকে এখন খোকা ডাকবেন না। আপনাকে তোমা বলেছি—খোকা নামটা এখন ওর পছন্দ না।

যার যা নাম তাই তো ডাকব। যার নাম খোকা তাকে আমি কি ডাকব বসিরুদ্দিন?

বসিরুদ্দিন বলার দরকার নাই—তার যা নাম তাই ডাকবেন। বুড়ো ধামড়াকে খোকা বলার দরকার কি?

নিজের স্বামীকে বুড়ো ধামড়া বলছ? এইসব কী বৌ?

স্বামী বুড়ো হলেও তাকে কচি বাবু ডাকতে হবে এইবা কেমন কথা?

রিমির গলা এখন বেশ ধারাল। ঝগড়ায় জোবেদা খানম এখন আর পারবেন না বলেই পিছিয়ে পড়লেন।

রিমি বলল, আরো কিছু বলবেন, নাকি আমি এখন যাব?

জোবেদা খানম বিজবিজ করে বললেন, অনির প্যান্ট বদলে দিয়ে যাও। ওর নিচে একটা কথা দাও। আবার বিছানা ভিজিয়েছে। পাঁচ বছর বয়স হলো—এখনো বিছানা ভেজায়। কতবার বললাম, একটা তাবিজটাবিজ দেয়ার ব্যবস্থা কর, তা শুনবে না। আমি একটা মানুষ না-কি? কে আমার কথা শুনবে? বাড়ির কুকুর-বেড়ালেরও একটা সম্মান আছে। আমার তাও নেই।

রিমি অনির প্যান্ট বদলে দিল। কাঁথা ভাঁজ করে অনির নিচে দিয়ে দিল। ঘমের মধ্যে বড় মিষ্টি লাগছে মেয়েটাকে। তার মেয়েটা রাজকন্যার মতো সুন্দর হয়েছে। রিমি অনির ঠোঁটে চুমু খেল।

জোবেদা খানম কঠিন গলায় বললেন, কতবার বললাম ঘুমের মধ্যে চুমু দেবে না। ঘুমের মধ্যে চুমু দিলে আয়ু কমে। অসুখবিসুখ হয়। নিয়ম-কানুন কিছু মান না বলেই তো অশান্তি হয়।

কোনো অশান্তি হয় না। আপনি চুপ করে ঘুমুতে চেষ্টা করুন তো। যত দিন যাচ্ছে, ততই আপনার যন্ত্রণা অসহ্য হচ্ছে।

জোবেদা খানম চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, অসহ্য হলে আমার জন্যে হচ্ছে না, তোমার জন্যে হচ্ছে। তখন বলেছিলাম পুলিশের মেয়ে বৌ করে আনার দরকার নাই। কেউ আমার কথা শুনল না। এখন একেবারে হাতেনাতে ফল।

রিমি অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল। ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছে না। তৌহিদের পাশে গিয়ে খানিকক্ষণ বসা যাক।

তৌহিদ বিছানায় উঠে বসেছে। শুধু যে বসেছে তাই না। সিগারেট ধরিয়েছে। রিমি সিগারেট নিয়ে কড়া কিছু কথা বলতে গিয়েও বলল না। আহা খেয়ে ফেলুক। এমন ভয়ংকর একটা খারাপ জিনিস পুরুষ মানুষেরা এত আগ্রহ করে খায় কেন কে জানে।

রিমি বলল, কফি আনব?

হুঁ।

কাল কিন্তু ডাক্তারের কাছে যাবে।

আচ্ছা।

আচ্ছা না, যাবে।

একবার তো গেলাম, কিছু বলতে পারল না। খামাখা টাকা নষ্ট।

ঐ ডাক্তার বলতে পারে নি বলে কেউ পারবে না–তাতো না। কাল যাবে কিন্তু।

আচ্ছা।

তৌহিদ সিগারেটে টান দিতে-দিতে বলল, আবার মার সঙ্গে ঝগড়া করলে? একজন বুড়ো মানুষ।

উনি কি-যে খারাপ ব্যবহার করেন, তা তো তুমি জান না।

তোমার যখন আশি বছর বয়স হবে, তখন তুমি এর চেয়েও খারাপ ব্যবহার করবে।

না আমি করব না। বিশ্বাস কর, আমি করব না।

বলতে-বলতে রিমি তৌহিদের হাতে হাত রাখল। হাতে হাত রাখাটা ঠিক হল না। রাগারাগি এখনো চলছে। এর মধ্যে আগ বাড়িয়ে.......অবশ্য দুপুররাতে শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করাটা অনুচিত হয়েছে। না করেইবা সে কী করবে? ভদ্রমহিলার মন এত ছোট। যত দিন যাচ্ছে, ততই ছোট হচ্ছে। এক সপ্তাহ হয় নি তাঁর সব গয়না তিনি দান। করেছেন। সব গয়না পেয়েছে তাঁর তিন মেয়ে। যে ছেলের বাড়িতে আছেন তার স্ত্রীর জন্যে কিছুই নেই। তার জন্যে কোনো চক্ষুলজ্জাও বোধ করছেন না। শাশুড়ির সামান্য গয়নার জন্যে রিমির কোনো ক্ষোভ নেই। কিন্তুি তিনি এমন করবেন কেন?

তারা রাত চারটার দিকে ঘুমুতে গেল। সোফা ছেড়ে খাটে উঠে আসতে রিমির একটু লজ্জা লাগছিল। এটা এক ধরনের পরাজয়। তবে মাঝেমাঝে পরাজিত হতে খারাপ লাগে না। তৌহিদ বলল, ঘুম আসছে না। একটা রিলাক্সেন খাব?

কিছু খেতে হবে না। তুমি চুপচাপ শুয়ে থাক।

শুয়েই তো আছি।

শ্বাসকষ্টটা নেই তো?

না।

রিমি স্বামীর কাছে ঘন হয়ে এল। তার ঘুমুতে ইচ্ছা করছে না। ইচ্ছা করছে গল্প করে রাতটা কাটিয়ে দিতে। কিন্তু আশ্চর্য, যে মানুষটা একটু আগেও বলছিল ঘুম আসছে না সে ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে রিমি। একা-একা জেগে থাকতে খুব খারাপ লাগে।

পাশের কামরা থেকে জোবেদা খানমের কথা শোনা যাচ্ছে। তিনি একা-একা ঝগড়া করছেন। আজ তাঁর প্রতিপক্ষ হচ্ছে আজরাইল। আজরাইল এত লোককে রোজ নিচ্ছে: তাকে কেন নিচ্ছে না—এটা তাঁর ক্ষোভের বিষয়। এই সংসারে থেকে তিনি আর অপমান সহ্য করতে পারছেন না। তাঁর মন্দ কপাল বলেই তিনি আশি বছর বয়সে হয়েছেন সকলের চোখের কাঁটা। বিশেষ করে তার ছেলের বৌয়ের। পুলিশের মেয়ে যেন সংসারে না আনা হয়—এই নিয়ে কত আপত্তি করলেন। কেউ তাঁর কথা শুনল না। এখন মজাটা তো হাতে-হাতেই দেখছে। কত কষ্টে যে তিনি এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে আছেন তা তিনি জানেন, আর জানেন উপরে মাবুদ।

রিমির ইচ্ছা করছে উঠে গিয়ে বলে এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে কে আপনাকে বলেছে? আপনি চলে গেলেই পারেন। আপনার তো আরো দুই ছেলে ঢাকা শহরেই থাকে। তাঁরা তো আর পুলিশের মেয়ে বিয়ে করে নি। তাদের সঙ্গে গিয়ে থাকলেই হয়। মেজোছেলের সঙ্গে পড়ে আছেন কেন? মেজোছেলে এমন কী রসগোল্লা?

বলা হল না। তবে জমা রইল। এক সময় রিমি বলবে। কঠিন-কঠিন কথা শুনাবে। আজকের রাতটা থাক।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি তেমন কোন বড় ঘটনা না। তবে এবারে অনেক দিন পর বৃষ্টি হচ্ছে। এটা যে শ্রাবণ মাস-রিমি ভুলেই গিয়েছিল।

২. সমস্যাটা কী বলুন তো

আপনার সমস্যাটা কী বলুন তো?

ডাক্তার পূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন। ইনি খুব ব্যস্ত ডাক্তার। রুগীর দিকে শুধু-শুধু তাকিয়ে নষ্ট করার সময় তাঁর নেই। প্রশ্ন করা মাত্রই জবাব চান। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, তৌহিদ কখনোই খুব গুছিয়ে কিছু বলতে পারে না। রিমিকে সঙ্গে নিয়ে এলে হত। রিমি আসত কিন্তু আজ সকালেই অনির খুব জ্বর এসেছে। রিমি অনিকে নিয়েই ব্যস্ত।

বলুন আপনার কী অসুবিধা?

তৌহিদ ইতস্তত করে বলল, তেমন কোনো অসুবিধা নেই।

ডাক্তারের চোখে বিরক্তি আরো গাঢ় হল, তিনি হাতের কলম নামিয়ে চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। যেন এক্ষুনি জেরা শুরু করবেন। কোর্টে বসে-বসে জেরা করার নিয়ম থাকলে এইভাবেই জেরা করা হত।

অসুবিধা নেই তবে এসেছেন কেন? আমার ভিজিট দুশ টাকা। শুধু-শুধু দুশ টাকা দিতে আসেন নি।

তৌহিদ বলল, মাঝে-মাঝে আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

এটাতো ভয়ানক অসুবিধা। অসুবিধা নেই বলছেন কেন? কত দিন পরপর এরকম হয়?

অনেক দিন পরপর হয়।

অনেক দিন মানে কত দিন? পাঁচ দিন, দশ দিন?

দু-তিন মাস পরপর একবার।

আপনি নিশ্চয়ই আমার আগেও অন্য ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন। কারণ, ঢাকা শহরের রুগীরা ডাক্তার বদলাতে খুব পছন্দ করে। যেই একজন বলল, অমুক খুব ভালো ডাক্তার, অন্নি দলবেঁধে সবাই ছুটল তার কাছে। আপনিও নিশ্চয়ই তাই করেছেন?

জ্বি।

ওদের প্রেসক্রিপশন আছে? ইসিজি, x-ray এইগুলো করিয়েছেন?

জ্বি।

দেখি?

ডাক্তার হাত বাড়িয়ে কাগজপত্র নিলেন। গভীর মনোযোগ কাগজপত্র দেখতে লাগলেন। তৌহিদের এই দৃশ্য ভাল লাগল। সাধারণত এক ডাক্তার অন্য ডাক্তারের কাগজপত্র এত মনোযোগ দিয়ে দেখেন না। বেশিরভাগ দেখতেই চান না।

আপনি কী করেন?

শিক্ষকতা করি।

স্কুল মাস্টার?

জ্বি।

কী পড়ান?

অঙ্ক। জিওগ্রাফি।

প্রাইভেট টিউশনি করেন?

করি।

তাহলে তো হাজার-হাজার টাকা কামান।

তা না। অল্প কয়েকজন ছাত্র। সংসার চালাতে হয়।

মদ্যপান নিশ্চয়ই করেন না?

জ্বি না।

ধূমপান করেন?

খুব কম।

স্পেসিফিক্যালি কথা বলুন। অঙ্কের টিচার হয়েও স্পেসিফিক্যালি কথা বলতে পারছেন না—এটা কেমন কথা। খুব কম মানে কত?

তিন-চারটা। কোনো কোনো দিন খাইও না।

ডাক্তার সাহেব খুব গম্ভীর গলায় বললেন, আপনার কোনো অসুখ নেই।

তৌহিদ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার সাহেব ভারি গলায় বললেন, অসুখ যদি কিছু থেকেও থাকে তবে তা আপনার মনে। আপনার শরীর পুরোপুরি সুস্থ।

শরীর সুস্থ?

জ্বি। আমার ধারণা কোনো বিশেষ কারণে আপনার মন খারাপ থাকলে তবে এই শ্বাসকষ্টটা হয়। আপনি বরং সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলুন।

তৌহিদ বলল, আমি কি চলে যাব?

চলে যাওয়াটাই তো উচিত। নাকি আরো কিছু বলতে চান?

জ্বি না।

প্রেসক্রিপশানে লেখা আপনার শ্বাসকষ্টটা রাতে হয়, যে রাতে কষ্টটা হয় সেই রাতে কি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার ঝগড়া হয়? কিংবা সেই দিন অফিসে বসের সঙ্গে ঝগড়া? মনে করে দেখুন তো?

তৌহিদ বলল, আমার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়।

আরে ভাই স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া তো আমার রোজই হয়, তাই বলে আমার শ্বাসকষ্ট হয় না। শোবার সময় দশ মিলিগ্রাম ফ্রিজিয়াম খাই, মরার মতো ঘুমাই। আপনাদের ঝগড়া কি খুব বেশি হয়?

জ্বি না।

তাহলে এই অবস্থা কেন? আপনি এক কাজ করুন। স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে কোথাও যান। ঘুরে-টুরে আসুন। তাতে মনের ওপর থেকে চাপ কমবে। কক্সবাজার চলে যান না। শুধু স্বামী-স্ত্রী। আণ্ডাবাচ্চা নিবেন না। হাত ধরাধরি করে সমুদ্রের পারে হাঁটবেন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।

আচ্ছা দেখি।

দেখি-দেখি করে বাঙালি জাতি শেষ হয়ে গেল। কোনো ডিসিশান নিতে পারে না-বলে দেখি। এত দেখাদেখির কী আছে?

রিমি খুবই গোছানো মেয়ে।

আজ অনেকগুলো ঝামেলা ছিল। সবই সে সুন্দর করে সামলাল। মেয়ের জ্বর অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। গা ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুছে দিল। তাপ অনেকটা নাম। বাকিটা নামল এ্যানালজেসিক সিরাপ খাইয়ে। রিমির ঘরে গৃহ চিকিৎসা বলে একটা চটি বই আছে। এই বই রিমির প্রায় মুখস্থ। ছোটখাট চিকিৎসা এখান থেকেই করে। জ্বর নেমে যাবার পরপরই অনি ঘুমিয়ে পড়ল। এই ফাঁকে রিমি রান্না সেরে ফেলল। ঘরে নদশ বছর বয়সী একটি কাজের ছেলে আছে। সে ঘুমানো ছাড়া কোনো কাজই ভালোমলত পারে না। তবু তাকে রিমি রেখেছে কারণ অসংখ্যবার দোকানে এটা-ওটা আনতে যেতে হয়। এই লবণ ফুরিয়ে গেল, এই তেল ফুরিয়ে গেল। ছেলেটির নাম জিতু।

ও জিতু মিয়া।

জ্বি আম্মা।

বাইরে দাঁড়িয়ে থাক। তোর স্যারের ছাত্ররা এলে বলবি আজ পড়াবে না। স্যার ডাক্তার দেখাতে গেছে।

জ্বি আচ্ছা আম্মা।

ওদের কাল আসতে বলবি।

জ্বি আচ্ছা।

আরেকটা কথা জিতু মিয়া, তোকে কতবার বলেছি আমাকে আম্মা ডাকবি না—আপা ডাকবি।

জিতু মিয়া দাঁত বের করে হাসল।

রান্না শেষ করে রিমি শোবার ঘরের পর্দাগুলোও ধুয়ে দিল। চারদিক ঝকঝকে পরিষ্কার থাকার আলাদা আনন্দ। এটা কেউ বুঝতে চায় না।

জোবেদা খানম বারান্দার ইজিচেয়ারে কাত হয়ে বসে আছেন। আজ তাঁর শরীরটাও ভালো না। মাথা কেমন ঝিমঝিম করছে। রিমিকে কয়েকবার বলেছেন, রিমি তেমন গা করে নি। শান্ত মুখে বলেছে, প্রেসার বোধ হয় বেড়েছে, চুপচাপ শুয়ে থাকুন।

একজন ডাক্তার খবর দাও মা। এই বয়সে হুট করে প্রেসার বাড়া কোনো কাজের কথা না। প্রেসার থেকে স্ট্রোক হয়।

কথায় কথায় ডাক্তার ডাকার অবস্থাতো মা সংসারের না। অনির যে এক শ তিন জ্বর উঠল—আমি কি ডাক্তার ডেকেছি?

ওর বয়স আর আমার বয়স কি এক হল মা? ও যা সহ্য করতে পারবে আমি তা পারব?

ঠিক আছে ও আসুক। ও এসে ডাক্তার ডেকে আনবে।

জোবেদা খানম চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, কিছু-কিছু কাজ মা ইচ্ছা না থাকলেও করতে হয়, যেমন বুড়ো শাশুড়ির চিকিৎসা। বিনা চিকিৎসায় মারা গেলে তোমরা লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। লোকে তোমাকে দেখিয়ে বলবে, শাশুড়িমারা বৌ।

রিমি কঠিন কণ্ঠে বলল, বলুক।

এখনই বলে, বুঝ না বৌ, এখনই বলে। তোমার নিজের মেয়েই বলে। তোমারে বলে কাচকচানি। সারাদিন যে কাচর্কাচ কর এই জন্যে বলে।

অনি কিছু বলে না। অনিকে আপনি শিখিয়ে দেন। ক্রমাগত আজেবাজে সব কথা আমার সম্পর্কে বলেন।

একটা কথাও মিথ্যা বলি না বৌমা। এইটা মিথ্যা বলার বয়স না।

রিমির এর উত্তরে কঠিন-কঠিন কথা তৈরি ছিল। বলা হল না। জিতু এসে বলল, একজন ভদ্রলোক না-কি আসছে। চোখে কালো চশমা। চোখে কালো চশমা থাকলে চেনা লোককেও অচেনা মনে হয়। এই লোকটি বোধহয় আসলেই অচেনা। রিমি চিনতে পারল না।

লোকটির গায়ে একটা গোলাপি রঙের গেঞ্জি। ত্রিশ বত্রিশ বছরের কোনো মানুষ কি গোলাপি গেঞ্জি গায়ে দেয়। পরনের প্যান্টের রঙ ঘন নীল। পায়ের জুতো সাদা। সাদা-নীল-গোলাপি এই তিনটি রঙের আলাদা কি কোন প্রভাব আছে? এত চমৎকার লাগছে তাকিয়ে থাকতে।

লোকটি রিমিকে দেখেও উঠে দাঁড়াল না। যে ভাবে বসা ছিল সেই ভাবেই বসে রইল। একটা পায়ের ওপর অন্য পা-টা রাখা। সেই পা অল্প-অল্প দুলছে। রিমি বলল, কে?

লোকটি বলল, আন্দাজ কর তো কে?

রিমি সঙ্গে-সঙ্গে চিনতে পারল। তার সারা গা বেয়ে শীতল সম্রাত বয়ে গেল। কেন সে প্রথম দেখাতেই চিনল না? নাকি প্রথম দেখাতেই চিনেছিল—শুধু ভান করেছিল যে চিনতে পারে নি? এই লোকটিকে কি এখন ভালো করে চেনা উচিত? বা চিনতে পারলেও কি বেশি সময় তার সামনে থাকা উচিত?

রিমি, চিনতে পেরেছ তো?

রিমি জবাব দিল না। চুপ করে রইল।

তুমি কি দাঁড়িয়ে থাকবে না বসবে? তোমার নিজের ঘরে তো আর তোমাকে আমি বসতে বলতে পারি না। আমি নিজেই তোমার অনুমতি ছাড়া বসে আছি।

রিমি বসল।

আমি যে আজই প্রথম এসেছি তা না, আগেও একদিন এসেছিলাম। তোমাদের কারো সঙ্গে দেখা হয় নি। তুমি, তোমার স্বামীকেউ ছিলে না। তোমার ছোট মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওর নাম বোধহয় অনি, তাই না?

হুঁ।

অনি বলে নি আমার কথা?

বলেছে—সেটা যে তুমি বুঝতে পারি নি।

রিমি বুঝতে পারছে তার কপাল ঘামছে। বুক ধকধক করছে। তার পরিষ্কার মনে পড়ছে সেদিন অনির হাতে ছিল বিশাল এক টিন চকলেট। অনি শুধু বলেছে একটা লোক তাকে দিয়েছে। লোকটা কে, কী, কিছুই বলে নি। অচেনা-অজানা একটা লোকের কাছ থেকে চকলেটের টিন নেবার জন্যে রিমি বরং রাগই করেছে। সেই অচেনা লোকা যে এতা কে জানত।

লোকটা হাসতে হাসতে বলল, প্রায় তের বছর পর দেখা, চিনতে পারবে কি পারবে না ভয়টা সব সময়ই ছিল। একবার ভাবলাম দাড়িগোঁফ কামিয়ে আসি। মুখ ভর্তি দাড়িগোঁফ অবস্থায় তো তুমি আমাকে কখনো দেখ নি—আমি নিজেই একনাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছি। তুমি তো কিছুই বলছ না। তোমার কি অস্বস্তি লাগছে?

না।

অস্বস্তি লাগা উচিত নয়। তের বছর আগে তোমার সঙ্গে কিছু পরিচয় ছিল, ঐ পরিচয়ের সূত্র ধরে এসেছি। আমি এর মধ্যে অন্যায় কিছু দেখছি না। তুমি দেখছ কি-না জানি না।

তুমি বস, আমি এক্ষুনি আসছি।

তোমাকে উঠতে হবে না। আমি চা-কফি, খাবারদাবার কিছু খাব না। তিন মিনিটের মধ্যে উঠব। আমার একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তা ছাড়া তুমি খুব বেশি রকম নার্ভাস হয়ে আছ। এত নার্ভাস হবার কোনো কারণ দেখছি না।

আমি নার্ভাস হই নি।

হয়েছ। আগে তুমি আমাকে কখনো তুমি করে বল নি। এখন বলছ। এটা নাভাস হবার লক্ষণ। এত নার্ভাস হচ্ছ কেন?

রিমি কিছু বলল না। মুখ লাল করে বসে রইল। আসলেই তো ফরহাদ ভাইকে সে কখনো তুমি করে বলে নি। সে এত বড় ভুল কী করে করল?

তোমার ঘর-দুয়ারতো খুব গোছানো।

আপনি কি ভেবেছিলেন অগোছানো দেখবেন?

আমি যা ভেবে রেখেছিলাম তা হয় নি। আমি ভেবেছিলাম খুবই বড়লোকের ঘরে তোমার বিয়ে হবে। বিরাট বাড়ি থাকবে, গাড়ি থাকবে, মালী থাকবে।

আমার মতো দরিদ্র অবস্থা দেখে নিশ্চয়ই মনে-মনে খুশি হয়েছেন?

খুশি হব কেন? আমি যে ছোট মনের মানুষ না-তা তো তুমি জান রিমি, জান না?

জানি।

উঠি। তিন মিনিট হয়ে গেল। অন্য এক সময় এসে তোমার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করে যাব।

কবে আসবেন? তুমিই বল।

রিমি কিছু বলতে পারছে না। তার সব কিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সে এই মানুষটাকে সত্যি-সত্যি আসতে বলছে। বলা কি উচিত?

ফরহাদ উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলল, শুক্রবার যদি তোমাদের কোনো প্রোগ্রাম না থাকে তাহলে তোমাদের সঙ্গে এসে ডিনার করতে পারি। আছে কোন প্রোগ্রাম?

না।

তাহলে এই সেটেড হল। আমি সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটার দিকে চলে আসব।

ফরহাদ চলে যাবার পরেও এই ঘরে প্রায় পনের মিনিট রিমি একা-একা বসে। রইল। তার মাথা ঝিমঝিম করছে। শরীর কাঁপছে। বুক ফেটে যাচ্ছে তৃষ্ণায়।

৩. কোনো কথা দ্বিতীয়বার বলতে

কোনো কথা দ্বিতীয়বার বলতে তৌহিদের ভালো লাগে না। মানুষের জীবনটা এমন যে–যা ভালো লাগে না–নিজ জীবনে তা ফিরে ফিরে আসে। তৌহিদের বাবা কানে কম শুনতেন। তিনি প্রতিটি প্রশ্ন তিনবার চারবার করে জিজ্ঞেস করতেন। রিমি কানে খুব ভালো শোনে তবু তার বিশ্রী অভ্যাস, প্রতিটি প্রশ্ন কয়েকবার করে জিজ্ঞেস করে।

ডাক্তার বলল তোমার কোনো সমস্যা নেই।

হুঁ।

হুঁ আবার কী, ঠিক মতো বল, ডাক্তার কীভাবে বলল কথাটা?

বলল, আপনার কিছু হয় নি।

বললেই হল? আমার চোখের সামনে দেখছি তুমি নিঃশ্বাস নিতে পারছ না। দম বন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছ আর ডাক্তার বলেছে কিছু হয় নি।

বললে কী আর করা।

তুমি প্রতিবাদ কর নি?

প্রতিবাদ কি করব? আমি তো ডাক্তার না। স্কুল মাস্টার।

স্কুল মাস্টাররা প্রতিবাদ করে না?

না। ওরা ছাত্রদের ধমক-ধামক দেয়। ঐ পর্যন্ত। MRCP ডাক্তারের সঙ্গে প্রতিবাদ করব আমার এত সাহস আছে? তাছাড়া ডাক্তার ঠিক কথাই বলেছে।

ডাক্তার ঠিক কথা বলেছে?

বলেছে ওটা মনের অসুখ।

রিমি বিরক্ত গলায় বলল, তুমি পরিষ্কার করে কিছু বলছ না কেন? ওটা মনের অসুখ এই কথা ডাক্তার কখন বলল? গুছিয়ে বল তো ব্যাপারটা কী? শুরু থেকে বল— তুমি ডাক্তারের ঘরে ঢুকলে; তখন ডাক্তার কী বলল?

ডাক্তার বলল, বসুন।

তারপর?

তারপর আমি বসলাম।

তারপর?

আমি বললাম, স্লামালিকুম।

তৌহিদ টের পাচ্ছে রিমি রেগে যাচ্ছে। রিমি আগ্রহ নিয়ে বসে আছে সব কিছু শুনবে- তৌহিদ গুছিয়ে বলতে পারছে না। এই লোক ক্লাসে পড়ায় কী করে কে জানে?

তারপর কি হল বল। ডাক্তার সাহেব নিশ্চয়ই জানতে চাইলেন তোমার অসুখটা কি, তাই না?

হুঁ।

তুমি বললে?

তৌহিদ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, অনির জ্বর কমেছে?

হ্যাঁ কমেছে। তুমি তোমার কথা বল। তুমি কি বললে?

আমার এখন আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। অন্য সময় বলব।

তৌহিদ উঠে দাঁড়াল। সে এখন হাত ধুয়ে ফেলবে। তার প্লেটে এখনো অনেক। ভাত। সে ক্ষিধে আন্দাজ করতে পারে না। শিশুদের মতো স্বভাব। প্লেট ভর্তি ভাত রেখে সে উঠে পড়ে। প্রতিদিন ভাত নষ্ট করে। রিমির কষ্ট হয়।

বেসিনে হাত ধুতে-ধুতে তৌহিদ বলল, মেয়েটার হঠাৎ জ্বর এল কেন? রিমি মুখ শক্ত করে বসে রইল। তৌহিদের কথার জবাব দিতে ইচ্ছে করছেনা। তৌহিদ তার কথার জবাব ঠিক মত দিচ্ছে না, সে কেন দেবে? তার এত কী দায় পড়েছে? তৌহিদ হাত ধুতে-

ধুতে বলল, মেয়েটাকে একটা ভালো ডাক্তার দেখানো দরকার। প্রায়ই জ্বরজ্বারি হয় এটা ভালো কথা না।

রিমি একটা কথার জবাব দিল না। আশ্চর্যের ব্যাপার, এতে লোকটা দুঃখিত হল না। সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘর থেকে বের হল। জিতুকে বলল, একটা পান দে।

রিমির চট করে মনে পড়ল—ঘরে পান নেই। জিতুকে আনতে বলা হয়েছিল জিতু আনে নি। রিমি জানে তৌহিদের সঙ্গে রিমির কী কথা হবে। রিমি এই মানুষটাকে বাচ্চাদের বাংলা কোনো বইয়ের মধ্যে পড়ে ফেলতে পারে। দাঁড়ি-কমাসুদ্ধ বলতে পারে, একটুও এদিক-ওদিক হয় না। জিতু বলবে-ঘরে পান নেই। লোকটা বলবে-আচ্ছা ঠিক আছে।

হলও তাই। জিতু বলল, পান আনতে ভুলে গেছে। তৌহিদ বলল, ঠিক আছে। লাগবে না। ছাত্ররা এসেছিল?

হুঁ। বলছি আজ পড়া হইত না। স্যারের শইল খারাপ।

আচ্ছা, ঠিক আছে।

রিমির রাগ দ্রুত বাড়ছে। সব কিছুতেই আচ্ছা ঠিক আছে কেন? নিজের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই? যে যা বলবে তাতেই আচ্ছা ঠিক আছে। বাড়িওয়ালা ঐদিন ডেকে নিয়ে এক ধাক্কায় পাঁচ শ টাকা বাড়ি ভাড়া বাড়িয়ে দিল। পানির ট্যাক্স বেড়েছে, ইলেকট্রিসিটির চার্জ বেড়েছে, হেনতেন কত কথা। লোকটা সবকিছু শুনে বলল,আচ্ছা, ঠিক আছে।

ঠিক থাকবে কীভাবে? এর মধ্যে ঠিক থাকার কী আছে? মুখের একটা কথাতেই বাড়ি ভাড়া পাঁচ শ টাকা বেড়ে যাবে? টাকা এত সস্তা? পাঁচ শ টাকা বেশি দিয়ে তারা এ বাড়িতে থাকবে কেন? ঢাকা শহরে বাড়ি কম পড়েছে?

অনি আজ বাবা-মার সঙ্গে শুয়েছে। রিমিদের খাটটা প্রকাণ্ড। বিয়ের সময় রিমির বাবা। মেয়েকে যেসব ফার্নিচার দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন তার মধ্যে খাট ছিল, ড্রেসিং টেবিল ছিল, সোফা ছিল। দেবার সময় দিয়েছে প্রকাণ্ড একটা খাট। আর কিছু না। ঐ খাট পেয়েই তৌহিদ খুশি। বিয়ের রাতেই কম করে হলেও তিনবার বলল, বাহ্ সুন্দর খাট তো! শুরুতে রিমির মনে হচ্ছিল ঠাট্টা করা হচ্ছে। সে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। তৌহিদের ছোট বোন খুব ক্যাটক্যাট করে কথা বলতে পারে সে কঠিন-কঠিন কথা শুনাচ্ছে—যা যা দেবার ছিল কিছুই দেয় নি—একটা ফুটবল মাঠে স্ট্যান্ড লাগিয়ে দিয়ে দিয়েছে। এর নাম নাকি খাট।

রিমির নিজেরও তার বাবার উপর খুব রাগ হয়েছিল। তার বাবা তাকে ঠকিয়েছে। অন্য বোনের বেলায় যেমন খরচপাতি করেছিলেন তার কিছু করেন নি। সব কিছু দায়সারা। ছেলেকে কাপড়চোপড় কেনার জন্যে দশ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিল; ঐ টাকাটা পর্যন্ত দেন নি। তৌহিদ কোনো দিন এ নিয়ে কোনো কথা বলে নি।

রিমি জিতুকে দোকানে পাঠিয়ে পান আনাল এবং একটা সিগারেটও আনাল। শোবার ঠিক আগে-আগে পান এবং সিগারেট পেলে মানুষটা নিশ্চয়ই খুশি হবে। সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো কি এই মানুষটা মনে রাখে? তাকে খুশি করার এই ধরনের চেষ্টা যে রিমির মনে আছে তা

কি এই মানুষটা টের পায়। সম্ভবত না। এক শ্রেণীর পাথর টাইপ মানুষ আছে জগৎ-সংসারের কোন কিছু যাদের স্পর্শ করে না।

রিমির হাত থেকে তৌহিদ পানের পিরিচ নিল। এমনভাবে নিল যেন সে জানত রিমি তার জন্যে পান-সিগারেট নিয়ে আসবে। এর জন্যে আলাদা করে কোনো ধন্যবাদ দেয়ার দরকার নেই।

তৌহিদ বসে আছে চেয়ারে। তার দৃষ্টি খাটের দিকে। খাটের মাঝখানে অনি কোলবালিশ নিয়ে ঘুমুচ্ছে। বিশাল খাটের মাঝখানটায় তাকে এতটুকু দেখাচ্ছে। তৌহিদ বলল, খাটটা আমার কাছে সমুদ্রের মতো লাগে। খাটটা কী বিশাল।

কী যে তুমি বল, এমন কী বিশাল? আমার দাদার আমলের খাট। ঐ সময় সব জিনিস বড়-বড় করা হত।

তা ঠিক। এখন আমরা যত সভ্য হচ্ছি; সব জিনিসও ছোট হচ্ছে।

ছোটই তো ভালল।

তা ঠিক, তবে কেন যেন শোবার খাটটা প্রকাণ্ড না হলে আমার আলো লাগে না। খাটটা হবে প্রকাণ্ড। যখন ঘুমুব মনে হবে সমুদ্রে শুয়ে আছি। তাই না?

রিমি তাকিয়ে আছে। হা, লোকটাকে এখন খুশি-খুশি মনে হচ্ছে। বেশ খুশি।

তৌহিদ বলল, ডাক্তার আমাকে কক্সবাজার যেতে বলল।

রিমি আশ্চর্য হয়ে বলল, কই, সে কথা তো বল নি।

আরে দূর-দূর, বললেই যাওয়া যায় না-কি?

কোনো কারণ আছে বলেই নিশ্চয় বলেছে।

কোনো কারণ নেই। কথার কথা; এম্নি বলেছে।

বিছানায় ঘুমতে যাবার ঠিক আগমহর্তে তৌহিদ বলল, একবার অবশ্য কক্সবাজার গেলে মন্দ হয় না। সমুদ্র কনো দেখা হয় নি। তুমি দেখেছ রিমি?

না।

তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না?

না।

আমার খুব করে। কেন করে সেই কারণটি একদিন তোমাকে বলব।

আজই বল।

আজ থাক। ঘুম পাচ্ছে। আরেকদিন বলব।

ফরহাদের কথাটা তৌহিদকে বলা দরকার। কীভাবে বলবে তা রিমি ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারছে না। এই গল্পটি কি তাকে বলা ঠিক হবে? সব কিছু কি সবাইকে বলা যায়? বলা উচিত? না থাক, কিছু বলার দরকার নেই।

রিমি খুব সহজেই ঘুমিয়ে পড়তে পারে। আজ ঘুমুতে পারল না। প্রায় সারা রাত জেগে কাটাল। কয়েকবার উঠে বারান্দায় পায়চারি করল। মাথায় পানি দিয়ে এল। কিছুতেই কিছু হল না। তার চোখ নিষ্ঠুম। মাঝেমাঝে এমন নিষ্ঠুম রাত তার আসে। তখন খুব খারাপ লাগে, রাত পার করে দিতে হয় বারান্দায় হেঁটে-হেঁটে। এই বাড়ির বারান্দাটা চমৎকার, হাঁটতে ভালো লাগে। ভালো লাগলেও বেশিদিন হাঁটা যাবে না। বাড়ি ছাড়তে হবে। পাঁচ শ টাকা বেশি দিয়ে এই বাড়িতে কে থাকবে? তাদের কি টাকার গাছ আছে? না, তাদের কোনো টাকার গাছ নেই। প্রতিটি টাকা তাদের খুব সাবধানে খরচ করতে হয়।

তৌহিদ সমুদ্র দেখার কথা বলেছে এটাতো কিছুই না। এত কাছে সমুদ্র। তবু এখন মনে হচ্ছে এটা বিরাট একটা কিছু।

জোবেদা খানম তাঁর ঘর থেকে চেচালেন, কে হাঁটে বারান্দায়? কে?

আমি।

তুমি নাকি? বারান্দায় হাঁট কেন?

এম্নি হাঁটি।

অনির জ্বর নাই তো?

না।

তাহলে অনিকে আমার এখানে দিয়ে যাও।

ওকে এখন আনতে পারব না মা। বাবার সঙ্গে ঘুমুচ্ছে।

একা-একা থাকি, একজন কেউ পাশে থাকলে ভালো লাগে।

অনিতো সব সময়ই আপনার সঙ্গে ঘুমায়। একাত না ঘুমুলে কিছু হবে না মা। ওর বাবার কাছ থেকে এখন আনতে পারব না।

জোবেদা খানম খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোমার কাছে যে লোকটা এসেছিল, সে কে?

কেউ না। আপনি ঘুমান তো। আপনার সব কিছু জানতে হবে না-কি?

এক সংসারে থাকি, কোথায় কী হচ্ছে জানব না? আমি তো একটা মানুষ। কোলবালিশ তো না। কোলবালিশ হলে চুপ করে থাকতাম। আল্লাহতালা আমাকে কোলবালিশ বানান নি। বানালেও কিছু করার ছিল না...

রিমি দরজার সামনে থেকে সরে এল। এইসব কথা শোনার কোনো অর্থ হয় না। এক-এক দিন এত বিরক্ত লাগে যে কাঁদতে ইচ্ছে করে।

বৌমা কি চলে গেলে না-কি? ও বৌমা....

জোবেদা খানম কোনো জবাব পেলেন না।

একটা সময় ছিল যখন কথার জবাব পাওয়া না গেলে মাথায় রক্ত উঠে যেত। এখন আর ওঠে না। জবাব না পাওয়াটাকেই স্বাভাবিক মনে হয়। একটা বয়সের পর মানুষ আর মানুষ থাকে না। কোলবালিশ হয়ে যায়। তিনি তাই হয়েছেন। এবং আশ্চর্য, এই জন্যে তাঁর খুব খারাপ লাগছে না। এই যে রিমি ফটফট করে বেড়াচ্ছে—সেও একদিন কোলবালিশ হবে। শুরুতে আরও খারাপ লাগবে; তারপর আর লাগবে না।

শুক্রবারে তৌহিদের কাছে কোনো ছাত্র পড়তে আসে না। আজ একজন এসে হাজির—মুনির। তৌহিদ কিছু বলবার আগেই মুনির বলল, গত সপ্তাহে দুদিন কামাই হয়েছে স্যার। তৌহিদের ইচ্ছা করছে ঠাস করে মুনিরের গালে একটা চড় বসিয়ে দিতে। তা না করে সে শান্ত গলায় বলল, আজ থাক।

কয়েকটা এক্সট্রা যদি দেখিয়ে দেন ভালো হয়।

অন্যদিন দেখাব। আজ না। আজ আমার শরীরটা ভালো না।

মুনির ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হচ্ছে ধাক্কা দিয়ে বের না করলে সে যাবে না। তৌহিদ ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বস দেখিয়ে দেই।

তৌহিদ পাঁচটা এক্সট্রা দ্রুত করে দিল। মুনির কিছু বুঝতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। আসল উপপাদ্য যে জানে নাসে এইসব কঠিন এক্সট্রার কী বুঝবে? গাধা মার্কা ছেলে। একটা বুদ্ধিমান ছাত্র পাওয়া গেলে ভালো হত। পড়িয়ে আনন্দ। এইসব গরুগাধার পেছনে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

মুনির বুঝতে পারছ তো?

পারছি স্যার। পানির মতো ক্লিয়ার।

ক্লিয়ার হলেই ভালো।

স্যার এই অঙ্কটা একটু দেখিয়ে দেন। এইটা কীভাবে করব স্যার? ঐকিক নিয়মে?

তৌহিদ শীতল গলায় বলল, তুমি অঙ্কে পাস করতে পারবে না। শুধু-শুধু পরিশ্রম করছ। সাধারণ অঙ্ক কোন নিয়মে করবে তাই যদি না জান...

মনির চোখ-মুখ শক্ত করে বসে রইল। তৌহিদ বলল, বিদ্যা যদি কোনো তরল পদার্থ হত তাহলে চামচে করে খাইয়ে দিতাম। বিদ্যা তরল পদার্থ না, বুঝলে?

মুনির কিছু বলছে না। তৌহিদ অঙ্কটা করল। সেই সঙ্গে এই নিয়মের আরো দুটো করে দেখাল। বই খুলে আরেকটা অঙ্ক বের করে বলল, এটা করতো, দেখি পার কিনা।

আজ থাক স্যার।

থাকবে কেন? কর।

দশটার সময় আমাকে স্যার আরেকজন চিটারের কাছে যেতে হবে। হরিবাবু, ইংরেজি পড়ান।

হরিবাবুর কাছে খানিকক্ষণ পরে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই। অঙ্কটা শেষ করে তারপর যাও।

মনির খাতা খুলে অঙ্ক টুকতে-টুকতে বলল, একটু টাইম লাগবে স্যার।

অসুবিধা নেই। তুমি অঙ্ক করতে থাক, আমি ভেতর থেকে আসি।

রিমি রান্নাঘরে।

তৌহিদ রান্নাঘরে ঢুকল। ছুটির দিনে সে রিমির সঙ্গে রান্নাঘরে কিছুটা সময় কাটায়। চুপচাপ বসে থাকে। রিমি রান্নাঘরের কাজকর্ম সারে। মাঝে-মাঝে বিরক্ত গলায় বলে, কি বিশ্রী স্বভাব। রান্নাঘরে বসে আছ কেন?

তোমার তো কোনো অসুবিধা করছি না।

ধুঁয়ার মধ্যে শুধু-শুধু বসে থাকা। চা খাবে?

খাব।

শোন-চা খাওয়াটাও কমাও। মিনিটে-মিনিটে চা।

আচ্ছা কমাব।

তৌহিদ লক্ষ করেছে রান্নাঘরের সময়টায় রিমি রেগে-রেগে অনেক কথা বললেও মনে-মনে বেশ খুশি হয়। এই খুশি ভাবটা সে চেপে রাখতে পারে না।

আজ রিমি বেশ গম্ভীর। তৌহিদকে ঢুকতে দেখেও অন্যদিনের মতো বলল না, আবার রান্নাঘরে ঢুকলে?

রিমি এক ঝলক তাকিয়েই নিজের মনে কাজ করতে লাগল। তৌহিদ বেতের মোড়ায় বসতে-বসতে বলল, চা হবে?

তোমার ছাত্র গেছে?

না যায় নি। চলে যাবে। ব্যাটা আজ আমার মেজাজটা খারাপ করে দিয়েছে।

কেতলিতে পানি গরমই ছিল। রিমি কাপে ঢালতে-ঢালতে বলল, আজ রাতে একজনের দাওয়াত আছে—সে খাবে। তুমি সন্ধ্যার পর কোথাও বেরুবে না।

তৌহিদ বিস্মিত হয়ে বলল,আমি তো সন্ধ্যার পর সব সময় ঘরেই থাকি।

বলে রাখলাম আর কি।

কে আসবে?

তুমি চিনবে না। ফরহাদ ভাই। আমাদের ময়মনসিংহের বাসার সামনের বাসায় থাকতেন। ঐ দিন হঠাৎ এসে উপস্থিত। আমি প্রথমে চিনতেই পানি নি। উনি নিজ থেকেই বললেন শুক্রবারে তোমাদের এখানে খাব। আমি তো আর বলতে পারি না–না।

তা বলবে কেন? দাওয়াত দিয়ে ভালোই করেছ। বাইরের কেউ এলে সেই উপলক্ষে ভালো-মন্দ খাওয়া হবে। অনেক দিন ভালো কিছু খাওয়া হয় না।

ভালো কিছু করব কোত্থেকে? টাকাপয়সার যা অবস্থা।

আমার কাছে কিছু আছে। মজিদ ধার নিয়েছিল—কাল কী মনে করে দিয়ে দিল। ও তো আবার ধার নিলে ফেরত দিতে ভুলে যায়।

কত টাকা?

পাঁচ শ নিয়েছিল। তিন শ ফেরত দিয়েছে। পুরোটাই আছে। আমি খরচ করি নি।

একজন চাইতেই তুমি পাঁচশ টাকা দিয়ে দিলে? আশ্চর্য!

খাতা দেখার টাকা পেয়েছিলাম। চাইল, না করতে পারলাম না।

আগে নিজে চলবে; তারপর তা অন্যকে ধার দেবে। ধার দাও ভালো কথা, আমাকে বলবে না?

রিমির চোখ-মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। সে নিচু গলায় বলল, প্রতিটা টাকা আমি হিসাব করে খরচ করি। তুমি কিছুই বুঝতে চাও না। বাড়িভাড়া পাঁচশ টাকা বাড়িয়েছেঐ নিয়েও কিছু বললে না। এক কথায় রাজি হয়ে এলে।

রাজি হই নি তো। চুপচাপ ছিলাম। কিছুই বলি নি।

চুপচাপ থাকাই তো রাজি হওয়া। স্কুল মাস্টারি করে-করে তোমার স্বভাব হয়েছে মিনমিনে। এই যুগে শক্ত না হলে চলে?

তা ঠিক।

স্কুল মাস্টাররাও তো আজকাল ভালো আছে। সাতটা-আটটা টিউশানি করে। দুতিন ব্যাচ করে পড়ায়। ওদের বাসায় ফ্রিজ-টেলিভিশন সবই আছে। শুধু তোমারই কিছু নেই। একটা ভালো নাটক হলে বাড়িওয়ালার বাসায় যেতে হয়।

একটা টেলিভিশন এই বছর কিনে ফেলব।

চট করে বলে ফেললে কিনে ফেলব। কোত্থেকে কিবে? আকাশ থেকে টাকার বৃষ্টি হবে?

আজ তোমার মন মনে হয় বেশি খারাপ। ডাক্তার আমাকে কী বলেছে জান? ডাক্তার বলেছে যেদিন তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয় সেদিনই শ্বাসকষ্টটা হয়। এটা আমার এক ধরনের মানসিক ব্যাধি।

অন্য কোনো ডাক্তারকে দেখাও। ঐ গাধা ডাক্তারকে দেখিয়ে লাভ নেই। গত মাসে তোমার যে শ্বাসকষ্ট হল ঐদিন কি তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছিল। চিড়িয়াখানায় গেলাম। ফিরে আসার পরপর....মনে নেই?

আছে, মনে আছে।

তৌহিদ চা শেষ করে উঠে পড়ল। মনিরের খোঁজ নিতে হয়। গাধাটা এখনো বসে কলম কামড়াচ্ছে না চলে গেছে কে জানে।

মনির যায় নি। সে হাসিমুখেই বসে আছে। তৌহিদ ঘরে ঢোকামাত্র বলল, অঙ্কটা মিলেছে স্যার। রেজাল্ট মিলিয়ে দেখছি। এইটা ছাড়াও আরো দুটা করে ফেলেছি।

তৌহিদ দেখল—অঙ্কগুলো হয়েছে।

হয় নাই স্যার?

হয়েছে। গুড।

আপনার কী মনে হয় স্যার? অঙ্কে পাস করব?

করবে। রাগের মাথায় এইসব বলি। রাগের কথা কখনো ধরতে নেই।

আমি স্যার ধরি না। বকা দিলে মনটা খারাপ হয়। সব জায়গায় বকা খাই। বাসায় বকা, বাইরে বকা। আমার স্যার কপালটা খারাপ।

তৌহিদের মন খারাপ হয়ে গেল। এই ছেলেটাকে বকাঝকা করা উচিত হয় নি। আসলে টিচার হবার যোগ্যতাটা তার নেই। একজন টিচার কখনো ছাত্রদের ওপর রাগবেন না। বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে একটা বিষয় দশবার বুঝবেন। তারপরও যদি ছাত্র বুঝতে না পারে সে ব্যর্থতা শিক্ষকের, ছাত্রের না।

স্যার আজ তাহলে যাই?

চল। আমিও তোমার সঙ্গে বেরুব। সিগারেট কিনব।

আগামী সপ্তায় আমি কি স্যার আসব না?

আসবে না কেন?

ম্যাডাম বলছিলেন, আপনারা কক্সবাজার যাচ্ছেন।

তাই নাকি? আমাকে তো কিছু বলে নি!

তৌহিদ খুবই বিস্মিত হল। রিমির স্বভাবের সঙ্গে সে পরিচিত। সে জানে রিমি ভেতরে কাজকর্ম অনেকদূর এগিয়ে একদিন হুট করে....এবারও তাই করছে। টাকাপয়সা কোত্থেকে জোগাড় করছে কে জানে। গয়না-টয়না বিক্রি করে দেয় নি তো? তার গয়না বিক্রির অভ্যাসও আছে। প্রয়োজনেই করে। গয়না বিক্রির পর কয়েকটা দিন খুব বিষণ্ণ থাকে। বেচারী। দরিদ্র শিক্ষকের ঘরে এসে খুব কষ্ট করল। সেই তুলনায় তার অন্য দুবোন রাজরানীর মতো আছে। তারাও ঢাকা শহরেই থাকে। নিজেদের বাড়িতে। দুজনেরই গাড়ি

আছে। এই তিন বোনের মধ্যে রিমিই সবচে সুন্দরী। এখনো রিমির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকাতে হয়। অথচ এই রিমিরই সবচে খারাপ বিয়ে হল। কোনো মানে হয় না।

তৌহিদ ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। মার্চ মাসের ঝকঝকে নীল আকাশ। এই নীল আকাশের ছায়া পড়বে সমুদ্রে। সমুদ্র এখন ঘন নীল। শ্রাবণ মাসে আকাশ যখন ঘন কালো রঙ নিয়ে নেবে তখন সমুদ্রও হবে কালো। আকাশ এবং সমুদ্র সব সময় একে অন্যের হাত ধরে চলে। তৌহিদের মনে হল, এদের দুজনের খুব মিল আছে। পৃথিবীর মানুষ জমি ভাগাভাগি করে নিয়ে নিয়েছে কিন্তু সমুদ্র এবং আকাশ এই দুটি নিতে পারে নি। কোনোদিন পারবে না।

বিকেল পাঁচটার মধ্যে রিমির রান্নাবান্না শেষ হয়ে গেল। অনেক কিছু করার ইচ্ছে ছিল করতে পারে নি। জিনিসপত্রের যা দাম। অল্প কয়েকটা পদ করতে গিয়েই সাড়ে তিন শ টাকার মতো খরচ হয়ে গেল। ঘরে আলো প্লেট ছিল না। দুটো প্লেট কিনতে লাগল চার শ। প্লেটের খরচও তো আজকের দাওয়াতের মধ্যে ধরতে হবে। রান্না কেমন হয়েছে কে জানে। ভালোই হবে। তার রান্না খারাপ না। পোলাওটা নিয়ে শুধু দুশ্চিন্তা। তার পোলাও কখনো ঠিক হয় না। হয় চাল থাকে, নয়ত নরম হয়ে যায়। পোলাও এখনো চড়ানো হয় নি। মেহমান এলে চড়ানো হবে।

রিমি গা ধুয়ে সবুজ রঙের একটা সুতির শাড়ি পরল। এটা তার পছন্দের শাড়ি। কোনো এক বিচিত্র কারণে এই রঙটাই তাকে মানায়। শুধু মানায় না-খুব বেশি রকম মানায়। এই শাড়ি নিয়ে কত কাণ্ড। বছর তিনেক আগে মেজো দুলাভাই তাকে সবুজ সিকের একটা

শাড়ি দিলেন। সেই শাড়ি পরে তার পরদিনই সে মেজো দুলাভাইয়ের বাড়ি বেড়াতে গেল। নতুন শাড়ি পড়ে মেজো দুলাভাইকে আর আপাকে সালাম করবে।

দেখা গেল শাড়ি উপহার দেবার কথা রিমির মেজো বোন রূপা কিছুই জানে না। তার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। রিমির দুলাভাই নাসিম সাহেব আমতা-আমতা করে বললেন, রিমি তার জন্মদিন উপলক্ষে আমার কাছে একটা শাড়ি চেয়েছিল—তাই দিলাম আর কি।

রিমি অবাক হয়ে বলল, আমি আবার আপনার কাছে কখন শাড়ি চাইলাম।

নাসিম সাহেব শুকনো গলায় বললেন, গত বছর চেয়েছিলে। তোমার মনে নেই।

রূপা খড়খড়ে গলায় বলল, ওর মনে নেই আর তুমি মনে করে বসে আছ? তোমার স্মৃতিশক্তি যে এত ভালো তা তো জানতাম না!

খুবই বিশ্রী অবস্থা। রূপা রিমিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, ও কি তোমাদের বাসায় প্রায়ই যায়?

রিমি বলল, না তো।

তোর মুখ দেখেই মনে হল তুই মিথ্যা কথা বলছিস। ও যায় প্রায়ই।

ছিঃ আপা!

আমাকে ছিঃ আপা করতে হবে না। আমি কচি খুকী না। আট বছর বিয়ে হয়েছে—আমাকে একদিন একটা শাড়ি কিনে দেয় নি, আর তোকে ঘরে গিয়ে শাড়ি দিয়ে এল?

রিমি ঐ শাড়ি আর পরে নি। ফেলে দিতে ইচ্ছে করছিল, ফেলতেও পারে নি। ন্যাপথলিন দিয়ে ট্রাংকের একেবারে নিচের দিকে রেখে দিয়েছে। কে জানে, হয়ত এর মধ্যে তেলাপোকায় কেটে দিয়েছে। কাটুক। কেটে ফেললে এই শাড়ি কাউকে দেয়া সহজ হবে।

সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল। ভালোই তো দেখাচ্ছে। গলায় যদি শুধু সবুজ পাথর বসানো হার থাকত। চোখে একটু কাজল কি দেবে? ক্ষতি কি? রিমি। আড়চোখে পাশের খাটে শুয়ে-থাকা তৌহিদের দিকে তাকাল। তৌহিদ ঘুমুচ্ছে। ছুটির দিনে দুপুরবেলায় সে ঘুমোয়। ঘুম ভাঙে সন্ধ্যার আগে-আগে। আজো তাই করবে। করুক। রিমি চোখে কাজল দিল। আয়নায় নিজেকে দেখে এখন কেন জানি লজ্জালজ্জা করছে। লজ্জার কিছুই নেই। বাইরের একজন মানুষ আসবে—সেই উপলক্ষে একটু সাজগোজ করলে ক্ষতি কি? তার দামি পারফিউম নেই, পাউডার নেই। সামান্য একটু কাজল।

রিমি বারান্দায় এসে দাঁড়াল। জিতু মিয়াকে ভেজা ন্যাড়া দিয়ে বারান্দা মুছতে বলে গিয়েছিল। সে তা না করে অনির সঙ্গে খেলছে। অনি কাগজে ছবি আঁকছে, জিতু মুগ্ধ চোখে তাই দেখছে।

অনি মাকে দেখেই মুগ্ধ গলায় বলল, মা তোমাকে অন্য বাড়ির বৌয়ের মতো লাগছে। জিতুও তাকিয়ে আছে। তার চোখেও মুগ্ধ বিস্ময়।

জোবেদা খানম তাঁর ঘর থেকে ডাকলেন, ও বৌমা, বৌমা। একটু শুনে যাও তো।

নিতান্ত অনিচ্ছায় রিমি শাশুড়ির ঘরে ঢুকল।

আজ সারাদিনে তোমার দেখা পেলাম না। ব্যাপার কি মা?

ব্যাপার কিছুই না।

ভালোভালো জিনিস রান্না হচ্ছে। ঘ্রাণ পাচ্ছি। কেউ আসবে?

হ্যাঁ।

সেটা আমাকে বলতে অসুবিধা কি? তোমার বাপের বাড়ির দিকের কেউ? বাপের বাড়ির দিকের কারোর আসার কথা থাকলে রান্নাবান্নার ধুম পড়ে যায়। শ্বশুরবাড়ির দিকের কেউ আসলে ঠন-ঠনা-ঠন—বেগুন ভর্তা, ডাল চচ্চড়ি।

এইটা বলার জন্যেই ডেকেছেন, না আরো কিছু বলবেন?

ছাদে কাপড় থাকলে নামিয়ে আন মাঝড়বৃষ্টি হবে। ঐ দেখ পিঁপড়া মুখে ডিম নিয়ে যাচ্ছে। যখন দেখবে পিঁপড়া মুখে ডিম নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে, তখন বুঝবে ঝড়বৃষ্টি হবে।

আপনি তো চোখেই দেখেন না। পিঁপড়ার মুখের ডিমও দেখে ফেললেন।

চোখে দেখি না তোমাকে কে বলল মা? রোজ যে কোরান শরীফ পড়ি শুনতে পাও না? গান-বাজনা তো সবই কানে ঢোকে। আল্লাহর পাক কালাম ঢোকে না? তুমি বাড়ির বৌ-নামাজ পড়বে। রোজা রাখবে। দুপাতা কোরান পড়বে। তা না–দিনরাত সাজসজ্জা।

সাজসজ্জার আপনি কি দেখলেন?

সবই তো দেখছি না। অন্ধ তো না। চোখ খোলা, কানও ভোলা। চারপাশে যা ঘটে সবই দেখি। সবই শুনি।

ভালো। আল্লাহ আপনার চোখ আরো ভালো করুক। কানও ভালো করুক।

রিমি ঘর ছেড়ে আবার বারান্দায় এল। জিতু মিয়া বারান্দা মোছা শুরু করেছে। ওকে দিয়ে বাড়িওয়ালার বাগান থেকে কয়েকটা গোলাপ এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখলে কেমন হয়? চাইলে দেবে কিনা কে জানে। কেউ ফুলে হাত দিলে খ্যাক করে ওঠে।

জিতু মিয়া।

জ্বি আম্মা?

বারান্দার কাজ শেষ হলে তুই বাড়িওয়ালার বাসায় যাবি, উনার বড় মেয়েকে আমার কথা বলে বলবি কয়েকটা গোলাপ ফুল দিতে। আচ্ছা থাক, তোর যেতে হবে না। আমিই যাব। শুধু ফুল আনলে হবে না। একটা টেবিল ক্লথ আনতে হবে। পানির ভালো জগ নেই। ওদের বাসায় একটা ক্রিস্টালের জগ আছে। রিমির নিজেরই যাওয়া দরকার।

জোবেদা খানম পিঁপড়াকে মুখে ডিম নিয়ে যেতে দেখেছেন কি-না কে জানে; তবে সন্ধ্যা মেলাবার আগেই আকাশ অন্ধকার করে ঝড়বৃষ্টি শুরু হল। ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। হাওয়ার শোঁ-শোঁ গর্জন। দেখতে দেখতে গলির মোড়ে এক হাঁটু পানি জমে গেল। বাসার সামনের আমগাছের একটা ডাল ভাল বিকট শব্দে। অনি ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগল।

নিমন্ত্রিত অতিথির আসবার প্রশ্নই ওঠে না। তবু রিমির মনে হল ফরহাদ ভাই আসবেন। যত রাতই হোক আসবেন। না এসে পারবেন না। তাঁকে আসতেই হবে।

তৌহিদ ক্ষিধে সহ্য করতে পারে না। সে দশটার সময় খেতে বসল। রিমি লাজুক গলায় বলল, আমি একটু অপেক্ষা করি। বৃষ্টি তত কমে এসেছে। এখন যদি আসেন।

তাহলে আমিও অপেক্ষা করি।

না, তুমি খেয়ে নাও।

বৃষ্টি ধরে এসেছিল এগারটার দিকে, আবার মুষলধারে শুরু হল। বারান্দায় বেতের একটা চেয়ারে সবুজ শাড়ি পরা রিমি একা-একা বসে রইল। তৌহিদ একবার এসে বলল, তুমি খাবে না?

রিমি জবাব দিল না। তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। সে খুব চেষ্টা করছে চোখের পানি সামলাতে পারছে না। নিজেকে খুব অপমানিত মনে হচ্ছে। যদিও অপমানিত মনে কার

কোনো কারণ নেই। ফরহাদ ভাই ঝড়বৃষ্টির কারণে আসতে পারেন নি এটা তো বোঝাই যাচ্ছে।

তৌহিদ মৃদু গলায় ডাকল, এই রিমি।

কি?

তোমার কাছে উনার ঠিকানা আছে? ঠিকানা থাকলে দাও খোঁজ নিয়ে আসি।

খোঁজ নিতে হবে না। রাতদুপুরে তাকে কোলে করে আনতে হবে না-কি? আসার হলে এম্নি আসবে।

এস তাহলে ভাত খেয়ে নাও।

খাব না। আমার ক্ষিধে মরে গেছে।

একটু কিছু মুখে দাও, এত কষ্ট করে রান্নাবান্না করলে।

রিমি উঠে দাঁড়াল। তার ক্ষিধে মরে গেছে কথাটা সত্যি না, বেশ ক্ষিধে পেয়েছে। সে রান্নাঘরে চলে গেল। ঠান্ডা খাবার রিমি মুখে দিতে পারে না, রাতদুপুরে খাবার গরম করতে বসতে হবে।

জোবেদা খানম ডাকলেন, ও খোকা এদিকে একটু আয়।

তৌহিদ সবেমাত্র সিগারেট ধরিয়েছে। রানো সিগারেট ফেলে দিয়ে মার ঘরে ঢুকল।

এসব কী হচ্ছে খোকা? হচ্ছে কী এসব?

কিসের কথা বলছেন?

বৌমা যে আজ আমাকে খেতে দিল না। চৌদ্দ পদের রান্না হয়েছে ঘরে আর আমি না খেয়ে বসে আছি।

তৌহিদ বিব্রত স্বরে বলল, ভুলে গেছে বোধ হয়.....

ঘরে পোষা পাখি থাকলে লোকে তাকে দানাপানি দেয়, একটা বিড়াল থাকলে মাছের কাঁটাটা খাওয়ায়...।

আমি ভাত নিয়ে আসছি।

তোকে কিছু আনতে হবে না। তুই কাল ভোরে আমাকে ছোটনের বাসায় রেখে আসবি।

তৌহিদ মার ঘর থেকে এল রান্নাঘরে। রিমি একটা প্লেটে খাবার নিয়ে দাঁড়িয়েদাঁড়িয়ে খাচ্ছে। তৌহিদকে দেখেই বলল, চুলা ধরানো আছে, তুমি কি চা খাবে?

দাও এক কাপ। আর ইয়ে শোন, মাকে রাতে খাবার দাও নি?

তাই বুঝি বললেন?

হুঁ।

আমি মাকে আর অনিকে রাত আটটায় একসঙ্গে খাইয়ে দিয়েছি। আজকাল উনার কিছু মনে থাকে না।

একটা প্লেটে করে নাহয় অল্প কিছু ....

আশি বছর বয়সের একজন মানুষ রাতে দুবার যদি খায় অবস্থাটা কী হবে জান? যখন ঘর নোংরা করা শুরু করবেন তখন সেসব কে পরিষ্কার করবে, তুমি?

তৌহিদ আরেকটা সিগারেট ধরাল। আজ সারা দিনে এটা হচ্ছে চার নম্বর সিগারেট। দিনে দুটার বেশি খাবে না এই প্রতিজ্ঞা টিকছে না। রিমি কিছু বলছে না। অন্য সময় সিগারেট ধরালেই সে কড়াচোখে তাকায়। আজ তাকাচ্ছে না। আজ তার মনটা ভালো নেই। তৌহিদ সিগারেট হাতে শোবার ঘরে চলে এল। রান্নাঘরের সমস্ত কাজকর্ম শেষ করে রিমি ঘুমুতে এল রাত বারটার দিকে। তখনো বৃষ্টি পড়ছে। ঝুম বর্ষণ। রিমি হালকা গলায় বলল, এখন জেগে আছ?

হুঁ।

আচ্ছা শোন, আমি ঠিক করেছি কক্সবাজার যাব। তুমি আমার দিকে তাকিও না, কাপড় বদলাব।

তৌহিদ মুখ ঘুরিয়ে নিল। রিমি বলল, একটা রাফ হিসেব করে দেখেছি হাজার পাঁচেক টাকা হলে আমরা তিনজন সপ্তাহখানিক থেকে আসতে পারি।

এত টাকা আছে তোমার কাছে?

রিমি তার জবাব না দিয়ে বলল, তুমি স্কুল থেকে দিন দশেকের ছুটি নাও।

সত্যি-সত্যি যাচ্ছি না-কি?

হুঁ।

পাঁচ হাজার টাকা তো অনেক টাকা।

রিমি চুপ করে রইল। তৌহিদ ক্ষীণ স্বরে বলল, গয়না-টয়না বিক্রি কর নি তো?

গয়না আছেইবা কী; বিক্রি করবইবা কী?

তৌহিদ লক্ষ করল রিমি একবারও গয়না বিক্রির কথা অস্বীকার করল না। তার মানে এই রকম কিছুই সে করেছে। বাবার বাড়ি থেকে অল্প যা কিছু গয়না-টয়না পেয়েছিল একে-একে এইভাবেই যাচ্ছে। গয়না বিক্রি করে সমুদ্র দেখার কোনো মানে হয়?

বাতি নিভিয়ে রিমি ঘুমুতে এল। মশারির ভেতরে কিছু মশা রয়ে গেছে। কানের কাছে ভনভন করছে। রিমির খুব ক্লান্তি লাগছে। আবার উঠে বাতি জ্বালিয়ে মশা মারতে ইচ্ছে করছে না। ভনভন করতে থাকুক।

তৌহিদ বলল, ঘুমিয়ে পড়লে না-কি?

রিমি বলল, না। তোমার আর কিছু লাগবে? এই ইঙ্গিতটা অন্য ধরনের। এর মধ্যে ভালবাসা নেই। তৌহিদ বলল, না কিছু লাগবে না।

রিমি সহজ স্বরে বলল, এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ তাই জিজ্ঞেস করলাম। আমাকে যখন প্রয়োজন হয় তখনি তুমি জেগে থাক। এই জন্যেই এই কথা বললাম। তুমি আবার রাগ-টাগ করে বস না।

তৌহিদ কিছু বলল না।

রিমি আগের মতো স্বরে বলল, ঘরের কাজকর্ম সেরে যখন ঘুমুতে আসি তখন দেখি তুমি আরাম করে ঘুমুচ্ছ। যেদিন দেখি জেগে আছ তখন বুঝি.....

রিমি কথা শেষ করল না। তৌহিদ বলল, রিমি ঘুমুও।

ঘুম এলে ঘুমুব। ঘুমের জন্যে আমাকে সাধাসাধি করতে হবে না।

আজ বোধহয় তোমার মনটা খারাপ।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

মন থাকলে তো মন খারাপ হবে। আমার মনই নেই।

ঝগড়া করার চেষ্টা করছ বলে মনে হচ্ছে।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে বিশ্বাস থাকতে হয়। যখন বিশ্বাস থাকে না তখন আর সেই সম্পর্কও থাকে না।

তৌহিদ বিস্মিত হয়ে বলল, বিশ্বাসের কী অভাব তুমি দেখলে?

তোমার মা বলল, তাকে খাবার দেয়া হয় নি; ওমি তুমি তা বিশ্বাস করে ফেললে।

আমি তা করি নি রিমি।

না করলে কেন আমাকে জিজ্ঞেস করতে এলে?

ভেবেছিলাম রান্নাবান্না, দাওয়াত এইসব নিয়ে তুমি ব্যস্ত ছিলে; ভুলে গেছ।

রিমি কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। তৌহিদ বলল, ঐ ভদ্রলোক কে?

কোন ভদ্রলোক?

যাকে তুমি খেতে বলেছ?

আমি কাউকে খেতে বলি নি। উনি নিজ থেকে আসতে চেয়েছেন। কেউ আসতে চাইলে আমি তাকে বলব আসবেন না?

তুমি শুধু-শুধু রাগ করছ। এসো ঘুমুতে চেষ্টা করি।

উনার সম্পর্কে আর কিছু জানতে চাও না?

না।

তুমি যা ভাবছ তা না।

আমি কী ভাবছি?

তুমি ভাবছ ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার গভীর প্রেম ছিল। আমি আমার প্রেমিককে নিমন্ত্রণ করেছি। সে আসে নি কাজেই রাগে-দুঃখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

এরকম কিছুই আমি ভাবছি না।

অবশ্যই ভাবছ। মুখে বলছ না–মনে-মনে ভাবছ। একটা বাংলা বই আমি যেভাবে পড়তে পারি তোমাকেও সেইভাবে পড়তে পারি। তুমি কখন কী ভাব, কী ভাব না, সবই আমি জানি।

তুমি তাহলে অন্তর্যামী।

হ্যাঁ, আমি অন্তর্যামী। আমি তোমাকে যেভাবে জানি, তুমি আমাকে সেভাবে জান। না। কারণ তুমি জানতে চাও না। আমার প্রতি তোমার কোনো আগ্রহ নেই। কয়েকদিন পরপর আমার শরীরটা কাছে পেলেই তোমার চলে যায়।

তৌহিদ প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বলল, মশারির ভেতর কয়েকটা মশা আছে বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ আছে। তবে এই মশা নিয়েও তোমার মাথাব্যথা নেই। তুমি উঠে বাতি জ্বেলে মশা মারবার চেষ্টা করবে না। মশার ব্যাপারে এই মুহূর্তে তুমি কী ভাবছ আমি বলব?

বল।

তুমি ভাবছ মশাগুলো এখন কানের কাছে ভনভন করে বিরক্ত করছে। সাময়িক একটা অসুবিধা সৃষ্টি করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এরা ভরপেট রক্ত খেয়ে ফেলবে তখন আর বিরক্ত করবে না। তখন আরামে ঘুমান যাবে।

তৌহিদ বিস্মিত হয়ে বলল, ঠিকই বলেছ।

আমি তো আগেই বলেছি, আমি তোমাকে, বইয়ের মতো পড়তে পারি।

তাই তো দেখছি।

রিমি পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, ঐ ভদ্রলোক সম্পর্কে তোমার দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এক সময় উনি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। এর বেশি কিছু না।

বিয়ে হল না কারণ আমি তখন ক্লাস টেনে উঠেছি। খুব কম বাবা-মাই এত অল্প বয়েসী মেয়ে বিয়ে দিতে চান। তাছাড়া ঐ ভদ্রলোকদের চালচুলা কিছুই ছিল না। আমাদের বাসায় জায়গির থেকে পড়ত।

তুমি কিন্তু বলেছিলে তোমাদের সামনের বাসায় থাকত।

বিয়ের প্রস্তাব দেবার পর বাবা তাকে ঘর থেকে বের করে দেন। তখন তিনি আমাদের বাসার সামনে একটা মেস ভাড়া করে থাকতেন। কাজেই তোমার কাছে। আমি মিথ্যা কথা বলি নি।

তৌহিদ খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, তোমার দিক থেকে কোনো আগ্রহ ছিল না?

না।

তৌহিদ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদুস্বরে বলল,আমি অবশ্যি শুনেছিলাম তুমি উনার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলে। গৌরীপুর স্টেশন থেকে তোমাকে ধরে আনা হয়।

রিমি শান্ত গলায় বলল, তোমাকে কে বলেছে?

তোমার মেজো দুলাভাই।

কখন বললেন?

অনেক আগে। আমাদের বিয়ের পরপরই বললেন।

তুমি আমাকে এতদিন এটা বল নি কেন?

বললে কী হত?

রিমি রাগের চেয়েও শান্ত গলায় বলল, তখন আমার বয়স ছিল খুব কম। আমি ঠিক...

বাদ দাও। ঘুমাও।

রিমি ক্ষীণ স্বরে বলল, আমি কখনো তোমার সঙ্গে মিথ্যে বলি না—এই একটা বলেছি। আই অ্যাম সরি।

তৌহিদ বলল, আমার দিকে ফিরে ঘুমাও। একটা হাত আমার গায়ে রাখ। রিমি ফিরল না। তার শরীর মাঝে-মাঝে কেঁপে-কেঁপে উঠছে। মনে হয় সে কাঁদছে। বাইরে বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস দিচ্ছে। বাতাসে জানালায় খটখট শব্দ উঠছে। যে মশাগুলি কানের কাছে ভনভন করছিল তারা এখন আর কিছু করছে না। সম্ভবত তাদের নৈশাহার সম্পন্ন হয়েছে।

৪. জোবেদা খানম কোরান শরীফ পড়ছিলেন

জোবেদা খানম কোরান শরীফ পড়ছিলেন। তার কোলে অনি। তিনি মাথা দুলিয়েদুলিয়ে পড়ছেন, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনিও মাথা দোলাচ্ছে। রিমি ঘরে ঢাকায় অনির মাথা দোলানো আরো বেড়ে গেল সে মার দিকে তাকিয়ে হাসল।

রিমি হাসল না। অনির এই অতিরিক্ত দাদীঘেঁষা স্বভাব তার পছন্দ না। সারাক্ষণ দাদীর সঙ্গে আছে। কোরান শরীফ পড়ছেন; তখনো কোলে বসা। রিমি বলল, কোল থেকে নাম অনি।

অনি হাসিমুখে বলল, না।

জোবেদা খানম কোরান শরীফ পড়া বন্ধ করলেন। রিমির ধারণা হল তিনি কঠিন কোন ঝগড়ার সূত্রপাত করবেন। প্রতিদিন সকালেই তা করা হয়। তা ছাড়া ঝগড়ার উপলক্ষও তৈরি হয়েছে অনিকে কোল থেকে নামতে বলা হয়েছে। কাল রাতে তাঁকে খাবার দেয়া হয় নি। এই ভুল তথ্যও তিনি টেনে আনতে পারেন।

রিমিকে আশ্চর্য করে জোবেদা খানম তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। অস্বাভাবিক নরম গলায় বললেন, আজ এত দেরিতে ঘুম ভাঙল যে বৌমা।

ঘুমুতে দেরি হয়েছিল।

ঠিক আছে, সবদিন কি আর সবকিছু নিয়মমতে চলে? মাঝে-মাঝে অনিয়ম হয়। আমাকেই দেখ না প্রত্যেকদিন ভাবি কোরান মজিদ পড়ব। পড়া আর হয় না। কতদিন পর আজ বসলাম। এক পারা পড়া হয়ে গেছে।

রিমি তাকিয়ে রইল। তার শাশুড়ির আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ সে ধরতে পারছে না।

বৌমা, একটু বস, কথা বলি।

রিমি বসল না। কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইল। জোবেদা খানম চোখ থেকে চশমা খুলতে-খুলতে বললেন, আমি কাপড়চোপড় কী নিব তাই তো বুঝতে পারছি না। ঐখানে এখন শীত না গরম?

কোথায় শীত না গরম?

কক্সবাজার।

কক্সবাজার?

অনি বলল, আমরা সবাই যাচ্ছি।

এই কাজটা মা খুব ভালো করেছ। এই জীবনে তো কিছু দেখলাম না। সমুদ্রটা দেখি। তোমার শ্বশুর সাহেব একবার ঠিক করল আমাদের সবাইকে নিয়ে যাবে, তখন খরচপাতির কথা চিন্তা করে আমি বললাম–বাদ দাও। যাওয়া হল না। ঐ বেচারাও দেখল না। আমি

দেখলেও কাজের কাজ হয়। মরার পর তোমার শশুর সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে বলতে পারব দেখে আসলাম।

রিমি খাটে এসে বসল। তার মুখ থমথম করছে। সে কঠিন-কঠিন কিছু কথা এখন তার শাশুড়িকে শোনাবে। কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। জোবেদা খানম বললেন, তোমার শ্বশুর সাহেবের এইসব বাতিক খুব ছিল। এখানে যাবে, ঐখানে যাবে। অবশ্য কোথাও শেষ পর্যন্ত যেতে পারে নি। যাবে কীভাবে? টাকাপয়সা কই? ছেলে-মেয়ে মানুষ করতে গিয়ে জিহ্বা লম্বা হয়ে গেল। যাক এখন আর পুরানো কথা বলে লাভ কি। তা বৌমা আমরা রওনা হচ্ছি কবে?

আপনি তোমা যাচ্ছেন না।

আমি যাচ্ছি না?

যাবেন কীভাবে বলুন। আপনি কি নিজের বয়সটার কথা ভাবেন না? এই বয়সে এত বড় জার্নি।

বয়স হয়েছে তা কী হয়েছে? আমি কি প্যারালিসিস হয়ে বিছানায় শুয়ে আছি? চলাফেরা করছি না? কাজকর্ম করছি না? গত বছরও পুরা তিরিশ রোজা করলাম। অসুবিধা হয়েছে কোনো? তুমি নিজে তো তিরিশ রোজা করতে পার নি।

আজেবাজে কথা বলে তো লাভ নেই মা। আপনাকে নিয়ে যাব না।

অনি গম্ভীর মুখে বলল, দাদীকে নিতে হবে।

তুমি চুপ কর তো অনি।

তুমি চুপ কর মা।

রিমি কঠিন চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। অনি সেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, দাদীকে নিতে হবে। দাদী না গেলে আমি যাব না।

জোবেদা খানমের মুখের হাসি বিস্তৃত হল। রিমি চলে এল রান্নাঘরে। সকালের নাশ্তার কোনো আয়োজন এখনো হয় নি। সে ঘুম থেকে উঠতে দেরি করেছে আর পুরো সংসার আটকে গেছে। জিতু মিয়াও নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। সাড়ে আটটার মতো বাজে। নটার মধ্যে তৌহিদকে স্কুলে রওনা হতে হবে।ভাগ্যিস স্কুল খুব দূরে না। দূরে হলে দুপুরে খেতে আসতে পারত না। খাবার দিয়ে দিতে হত। সে আরেক যন্ত্রণা।

জোবেদা খানম ধরেই নিলেন তাকে সঙ্গে নেয়া হবে। স্বামীর সংসারে তার কথার ওপর কেউ কথা বলে নি। পুত্রদের সংসারে এসেও তাই হয়েছে। রিমির সঙ্গে তাঁর প্রায়ই লেগে যাচ্ছে তা ঠিক, তবুও শেষ পর্যন্ত তাঁর কথাটি বহাল থাকছে। গত ঈদে তিনি বললেন, অনিকে শাড়ি কিনে দিতে হবে। রিমি শুনেই রেগে উঠল, চার বছর বয়েসী মেয়ের আবার শাড়ি কি? তিনি বললেন, ছোট মেয়েদের শাড়ি পাওয়া যায়, শাড়িই দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত শাড়ি, জামা দুটাই হল। অনি ঈদের দিন জামা পরল না, সে শাড়ি পরেই থাকবে। জোবেদা

খানম মনে-মনে বললেন, এখন ভালো হয়েছে। ভোঁতা মুখ থোতা হয়েছে। যেমন ব্যবহার তেমন ফল।

তিনি খুব ভালো করেই জানেন, তাকে ছাড়া ওরা কোথাও যেতে পারবে না। অনি বেঁকে বসবে। কাজেই জিনিসপত্র এখন থেকেই গোছানো শুরু করা দরকার। নিজের বিছানা-বালিশ ছাড়া তার ঘুম হয় না। বিছানা-বালিশ সঙ্গে নিতে হবে। মশারিটা ময়লা হয়ে আছে। মশারি ধুয়ে দিতে হবে।জিতুকে বললে সে কি ধুতে পারবে? মনে হয় না। বড়ছেলের বাসায় মশারি পাঠিয়ে দিলে হয়। ওর বাসায় বড়-বড় কাজের মানুষ আছে, ওরা ধুয়ে ইস্ত্রি করে দেবে। এক জোড়া ভালো স্যান্ডেল দরকার। জোবেদা খানম অনিকে পাঠিয়ে রিমিকে ডেকে আনলেন।

ও বৌমা আমার মশারিটা ইরিসের বাসায় পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

কেন?

ওরা মশারি ধুয়ে দিবে। এ রকম ময়লা মশারি নিয়ে তো বিদেশ যাওয়া যায় না। দশ জনে দেখবে।

রিমি বিরক্তি গলায় বলল, আপনি সারাজীবন ঝামেলা করেছেন। আর করবেন না। আপনি কোথাও যাচ্ছেন না।

তোমার মুখের কথায় তো মা দুনিয়া চলে না। দুনিয়া চলে আল্লাহ পাকের হুকুমে। আল্লাহ পাকের যদি হুকুম হয় আমাকে না নিয়ে তোমার উপায় নেই।

রিমি কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল।

জোবেদা খানম ভাবলেশহীন গলায় বললেন, এরকম তাকিয়ে থাকলেও কিছু হবে না মা। তুমি মশারি আর আমার হলুদ কাঁথাটা ইরিসের বাসায় পাঠাও। আর ইরিসকে বল সে যেন আমাকে কিছু হাত-খরচ দেয় আর এক জোড়া নরম স্যান্ডেল কিনে দেয়।

এই বৃদ্ধার কথা দাঁড়িয়ে শোনা অর্থহীন। রিমি শুকনো মুখে ঘর ছেড়ে চলে এল। শাশুড়ির কথায় তার অবশ্যি লাভ হয়েছে। কাপড় ধোয়ার কথাটা মনে হয়েছে। অনেক কাপড় ধুতে হবে। অনির জুতা আছে, স্যান্ডেল নেই। অনির জন্যে স্যান্ডেল কিনতে হবে। বালিতে জুতা পরে হাঁটা যায় না। স্যান্ডেল থাকলে খুলে হাতে নেওয়া যায়। রিমি নানান কাজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে রইল তবে তার কান পড়ে রইল বসার ঘরের দরজায়। সে নিশ্চিত ছিল ফরহাদ আজ আসবে। ঝড়-বৃষ্টির জন্যে কাল আসতে না পারায় লজ্জা প্রকাশ করবে। রিমি ঠিক করে রেখেছিল এগারটা সাড়ে এগারটার দিকে এলে সে তাকে দুপুরে খেয়ে যেতে বলবে। নতুন কিছু করতে হবে না। এগুলো গরম করে দিলেই হবে। বাড়িওয়ালার বাড়ি থেকে আনা জগটা এই কারণেই ফেরত দেওয়া হয় নি।

আশ্চর্যের ব্যাপার, ফরহাদ এল না। তার পরের দিনও না। তার পরের দিনও না।

রিমির মনে হল ভালোই হয়েছে। না আসাই ভালো। পুরানো কথা কে মনে করতে চায়? তার এত কী দায় পড়েছে পুরানো কথা ভাববার? আর সে কেনইবা ভাববে? অল্প বয়সে সে একটা ভুল করেছিল, সেই ভুল এতদিন পর মনে করার কোনো প্রয়োজন নেই। সে মনে করতে চায় না। এম্নিতেই তার অনেক যন্ত্রণা। আর যন্ত্রণা বাড়ানোর দরকার কি?

ঐদিন উনাকে নিষেধ করে দিলেই সবচে ভালো হত। বললেই হত-না, আপনার আসার দরকার নেই। কেন সে এই সহজ কথাটা বলতে পারল না? এমন তো না সে কথা বলতে পারে না। সে কথা ভালোই বলতে পারে। বাড়ি ছেড়ে পালানোর কথাই ধরা যাক। ট্রেনে ওঠার পর সে ক্রমাগত কথা বলতে লাগল। এক পর্যায়ে ফরহাদ ভাই বললেন, তুমি এত কথা বলছ কেন? সে রাগ করে বলল, বেশ করছি বলছি। আপনার শুনতে ইচ্ছা না হলে ঐ পাশের সিটে গিয়ে বসুন। আমার পাশে থাকলে আমি কথা বলব।

ফরহাদ ভাই নিচু গলায় বললেন, লোকজন কী মনে করছে।

যার যা ইচ্ছা মনে করুক। আমি কি কাউকে ভয় পাই?

না সেদিন রিমির একটুও ভয় লাগছিল না। বাসা থেকে পালিয়ে আসার জন্যে মন খারাপ লাগছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল, এত আনন্দ পৃথিবীতে! যা দেখছে তাই ভালো লাগছে। টেলিগ্রাফের তারে ফিঙে পাখি বসে আছে। কী সুন্দর লাগছে পাখিটাকে! ট্রেনের কামরায় যাত্রীদেরও ভালো লাগছে। পা ভাঙা এক লোক নিম টুথ পাউডার বিক্রি করছে। তার বক্তৃতাও শুনতে ভালো লাগছে। ইচ্ছা করছে এই গরিব বেচারার সব কটা কৌটা সে কিনে ফেলে। তার এত ভালো লাগছে অথচ তার পাশে বসে থাকা মানুষটা ভয়ে-দুশ্চিন্তায় এতটুকু হয়ে গেছে। এত কিসের দুশ্চিন্তা? সবকিছু তো ঠিকঠাক করাই আছে। তারা যাবে ভৈরব। ভৈরবে ফরহাদ ভাইয়ের মেজো মামা থাকেন। পুলিশ ইন্সপেক্টর। উনি ফরহাদ ভাইকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। ফরহাদ ভাই অর কাছে কেঁদে পড়বেন এবং বলবেন এই একটা কাজ ঝোঁকের মাথায় করে ফেলেছি। সেই পুলিশ ইন্সপেক্টর মামা তখন একটা ব্যবস্থা করবেন। মৌলানা ডাকিয়ে বিয়ে পড়িয়ে দেবেন। সব তো ঠিক করাই আছে, তবু

ফরহাদ ভাই এত ভয় পাচ্ছে কেন? রিমি এক সময় বলল, আপনার মুখটা ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

ফরহাদ ভাই বিড়বিড় করে বললেন, ধর মামাকে যদি বাসায় গিয়ে না পাই?

পাবেন না কেন?

উনি প্রায়ই ট্যুরে যান।

মামা না থাকলে কী–মামী তো থাকবেন।

মামী আমাকে দেখতে পারেন না। তোমাকে সঙ্গে করে ঐ বাড়িতে উঠলে মামী ঘাড় ধরে বের করে দেবেন।

দিলে দিবে। আমরা কোনো একটা হোটেলে গিয়ে উঠব। আমার খুব হোটলে থাকার শখ। আচ্ছা ভৈরবে হোটেল আছে তো?

ফরহাদ ভাই সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বিষণ্ণ মুখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বিষণ্ণ মুখ দেখে মায়ার বদলে রিমির খুব মজা লাগতে লাগল।

গৌরীপুর স্টেশনে ট্রেন-বদল করতে হয়। রিমিকে রুমে বসিয়ে ফরহাদ গেল চা আনতে। তার মিনিট দুএকের মধ্যে রিমির মেজো চাচা এসে বিস্মিত হয়ে বললেন, তুই এখানে কোথায় যাচ্ছিস...কার সঙ্গে যাচ্ছিস...

রিমি কোনো জবাব দিতে পারল না। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মেজো চাচা আবার বললেন, কি রে, তোর বাবা-মা কোথায়? কার সঙ্গে এসেছিস?

রিমির চিন্তাসূত্র কেটে গেল। জিতু মিয়া এসে বলল, একজন ভদ্রলোক এসেছে।

রিমির বুক ধক করে উঠল। হকচকানো গলায় বলল, কে, কে এসেছে রে?

চিনি না আফা।

চোখে চশমা আছে?

হুঁ।

রিমি ভেবে পেল না সে এই অবস্থাতেই যাবে না কাপড় বদলাবে। সে বালতিতে। কাপড় ভিজিয়েছিল। সাবানপানিতে তার শাড়ি মাখামাখি। চুল বাঁধা নেই। এইভাবে কারো সামনে যাওয়া যায়? কাপড় বদলাতে কতক্ষণ লাগবে? রিমি অবশ্য শেষ পর্যন্ত কাপড় বদলাল না। যেমন ছিল তেমনি বের হয়ে এসে দেখে ফরহাদ ভাই নন। অপরিচিত একজন মানুষ। মেয়ের জন্যে প্রাইভেট টিউটর চান। সেই বিষয়ে কথা বলতে এসেছেন।

রিমি কঠিন গলায় বলল, ও বাসায় গিয়ে কাউকে পড়ায় না। আপনি অন্য কারো কাছে যান। ভদ্রলোক অবাক হয়ে রিমির দিকে তাকালেন—এমন চমৎকার মেয়ের কাছে এমন কঠিন স্বরে কোনো উত্তর তিনি হয়ত আশা করেন নি।

৫. কক্সবাজার রওনা

জোবেদা খানম কল্পনাও করেন নি তাঁকে বাদ দিয়েই তারা কক্সবাজার রওনা হবে। শেষ রসা ছিল অনি। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল অনি বিকট চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করবে। সেই অনিও কিছু বলছে না। সে তার নিজের কাপড়চোপড় গোছানো নিয়ে ব্যস্ত। তার জন্যে আলাদা একটা সুটকেস নেয়া হচ্ছে। সে খুব ব্যস্ত। দাদীর দিকে ফিরে তাকানোরও সময় নেই।

জোবেদা খানম ভেবেছিলেন শেষ মুহূর্তে হয়ত তারা মত বদলাবে। তখন যাতে ঝামেলা না হয় সে জন্যে তিনি নিজেও সব কিছু গুছিয়ে রেখেছেন। ছোট মেয়ের বাসা থেকে একটা বড় ফ্লাস্ক এনেছেন। ফ্লাস্ক ভর্তি চা থাকবে। এই বয়সে একটু পরপর চা খেলে ভালো লাগে। নতুন স্যান্ডেল বড় ছেলে কিনে দিয়েছে। একটা সুতির চাদর কিনেছেন।

এত কিছু করেও কিছু হল না। শেষ মুহূর্তে লক্ষ করলেন তাকে এখানে রেখেই সবাই রওনা হচ্ছে। তাদের ট্রেন রাত সাড়ে এগারটায় পূর্ণা নিশীথা। তারা নটার সময়ই রওনা হল।

জোবেদা খানমের বড় ছেলে একট গাড়ি নিয়ে এসেছে। সে সবাইকে স্টেশনে নামিয়ে মাকে নিজের বাসায় নিয়ে যাবে। জোবেদা খানমের এই ছেলেও তৌহিদের মতো কথাবার্তা বলে না। চুপচাপ বসে থাকে। এখনো তাই করছে। বসার ঘরে চুপচাপ বসে আছে। যেন এই পৃথিবী, এই জগৎ-সংসারের সঙ্গে তার কোনোযোগ নেই।

রিমি আর অনি জোবেদা খানমের কাছ থেকে বিদায় নিতে এল। রিমি বলল, মা আমরা রওনা হচ্ছি।

তিনি জবাব দিলেন না, হাতের তছবির মালা দ্রুত ঘুরতে লাগল।

আমাদের জন্য দোয়া করবেন, মা।

আচ্ছা।

আপনাকে নিতে পারছিনা মাশরীরের অবস্থা তত ভালোনা। লম্বা জানি। দিনের মধ্যে অনেকবার আপনাকে বাথরুমে যেতে হয়।

আচ্ছা। আচ্ছা, বুঝলাম তো।

রিমি পা ছুঁয়ে সালাম করল। অনি খুব মজা পাচ্ছে। মা তার দাদীকে সালাম করছে। এই দৃশ্য তার খুব মনে ধরেছে।

অনি দাদীকে সালাম কর।

উহুঁ। আমি করব না।

যাও, দাদীর দোয়া নিয়ে আস। মা ওকে একটু ফুঁ দিয়ে দেন।

জোবেদা খানম নাতনীকে কোলে বসিয়ে মাথায় ফুঁ দিলেন। গাঢ় স্বরে বললেন, ফ্লাস্কটা নিয়ে যাও মা। কাজে লাগবে।

মা, আপনি মনে কোনো কষ্ট নেবেন না।

না কষ্ট আর কী। বেঁচে থাকাই কষ্ট, এ ছাড়া আর কষ্ট কী?

তাহলে আমরা রওনা হই মা?

আচ্ছা-আচ্ছা। তুমি গায়ের চাদরটাও নিয়ে যাও। সমুদ্রের বাতাসে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

চাদর লাগবে না।

আহা নাও না।

রিমি চাদর নিল। জোবেদা খানম বললেন, স্যান্ডেল জোড়া পায়ে দিয়ে দেখ তো— লাগে কি-না। লাগতে পারে। তোমার পা ছোট।

স্যান্ডেল লাগবে না। স্যান্ডেল আছে।

আহা, নাও না! নতুন স্যান্ডেল। আমি পায়ে দেই নি।

রিমি লক্ষ করল, তার মন খারাপ হতে শুরু করেছে। এই কঠিন শুষ্ক বৃদ্ধার হৃদয়ের গহীনে স্নেহের ফল্গুধারা আছে। সব সময় চোখে পড়ে না। হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ঝলসে ওঠে।

এইখানে কিছু টাকা আছে। এটা রাখ। বিদেশ জায়গা। কখন কী দরকার হয়।

ময়লা রুমালে বাঁধা ছোট্ট একটা পুঁটলি তিনি এগিয়ে দিলেন। এটা জোবেদা খানমের সারা জীবনের সঞ্চয়। ছেলেরা যখন যা দিয়েছে, তিনি জমা করে রেখেছেন। ছোট-ছোট নোটগুলো বদলিয়ে বড় নোট করেছেন।

টাকা নেয়ার ব্যাপারে রিমি কোনো আপত্তি করল না। তার টাকা খুব দরকার।

সাবধানে থাকবে মা, যে কোনো জায়গায় রওনা হবার আগে বাঁ পা আগে ফেলবে। আর মনে-মনে বলবে ইয়া মুকাদ্দিমু। মেয়েদের জন্যে বাঁ পা—পুরুষদের জন্যে ডান পা। মনে থাকে যেন।

জ্বি, মনে থাকবে।

রাতে অনিকে স্যুয়েটার গায়ে দিয়ে রাখবে। নতুন জায়গা–ফট করে বুকে ঠাণ্ডা বসে যেতে পারে।

আমরা তাহলে মা রওনা হই?

আচ্ছা রওনা হও। ফি আমানিল্লাহ, ফি আমানিল্লাহ।

ট্রেন সাড়ে এগারটায় ছাড়ার কথা ঠিক সাড়ে এগারটায়ই ছাড়ল। তৌহিদের বিস্ময়ের সীমারইল না। সে অনেকদিন ট্রেনে চড়ে না। তার ধারণা ছিল, এ দেশে ট্রেনের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। ওদের মর্জিমতো এক সময় ছাড়ে। এখন দেখা যাচ্ছে–ব্যাপার তা না। ট্রেনের কামরাও সুন্দর। সবার জন্যে সিট আছে। দাঁড়িয়ে যাবার কোনো ব্যাপার নেই।

দুটো মুখোমুখি সিটে তারা বসেছে। তাদের সঙ্গে তৃতীয় এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বললেন, আপনারা মেয়েটাকে এই সিটে বসিয়ে দিন, আমি অন্য এক জায়গায় বসছি। আজ ভিড় কম। গাড়ি ফাঁকা যাচ্ছে।

তৌহিদ এই মানুষটির ভদ্রতাতেও মুগ্ধ হল। আজকাল ভদ্রতার ব্যাপারটা চোখে পড়ে না। বাসে মহিলারা দাঁড়িয়ে থাকেন। বসে-থাকা পুরুষ যাত্রীরা দেখেও না দেখার ভান করেন। উদাস দৃষ্টিতে তারা জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন।

রাতের গাড়ি হহ করে ছটে চলেছে। সট-সট করে স্টেশন পিছে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। টঙ্গির মতো বড় স্টেশনেও গাড়ি থামল না, ছুটে বের হয়ে গেল।

অনি বলল, বাবা আমি কিন্তু সারারাত ঘুমুব না। জেগে থাকব।

আচ্ছা, থাকবে।

আর এই জানালার কাছের জায়গাটা আমার। এখানে কেউ বসবে না।

আচ্ছা।

তৌহিদ সিগারেট ধরাল। রিমি তাকাল, কিছু বলল না। সে ঠিক করে রেখেছে বেড়ানোর এই সময়টায় সে তৌহিদকে কিছুই বলবে না। একটা কড়া কথা বলবে না। একবারও কঠিন চোখে তাকাবে না। তারা কখনো কোথাও বের হতে পারে না। এই প্রথম বের হল। এই আনন্দ যেন নষ্ট না হয়।

রিমি।

বল।

যাত্রায় নিয়ম নাস্তি—এই জন্যেই অসময়ে সিগারেট রালাম। রাগ করছ না। তো?

রাগ করছি না এটা বললে তৌহিদ প্রশ্রয় পাবে, কাজেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রিমি বলল, আমার আগে তুমি কি মার সঙ্গে দেখা করেছ?

না।

দেখা করলে না কেন?

তৌহিদ কিছু বলল না। সে দেখা করে নি কারণ তার খুব খারাপ লাগছিল। বেচারীর এত শখ ছিল।

রিমি বলল, মা আমাকে টাকা দিয়েছেন। তোমাকে বলা হয় নি।

কত টাকা?

অনেক। দুই হাজার সাত শ বিয়াল্লিশ।

বল কী!

সব চকচকে নোট। খরচ করতে মায়া লাগবে।

তৌহিদ খুশি-খুশি গলায় বলল, তাহলে রাজার হাতে থাকা যাবে–কী বল?

মার দেয়া টাকাটা তুমি তোমার মানিব্যাগে রাখবে। তোমার ইচ্ছামতে খরচ করবে।

টাকা খরচ করতে আমার ভালো লাগে না রিমি। উপার্জন করতে ভালো লাগে না, আবার খরচ করতেও ভালো লাগে না। আমি একেবারে বাবার স্বভাব পেয়েছি।

উনি কি তোমার মত চুপচাপ থাকতেন?

না, তা না। বাবার খুব হৈচৈ করা স্বভাব ছিল। তাঁর মাথার মধ্যে নানান রকম পরিকল্পনা ঘুরত। আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন শুনি বাবা সাইকেলে করে সারা ভারতবর্ষ ঘুরবেন। এই জন্যে তিন মাসের ছুটি নিবেন। ভালো সাইকেল কেনার জন্যে কিছুদিন খুব ঘুরলেন।

তারপর?

তারপর আর কী? একদিন পরিকল্পনা স্থগিত হয়ে গেল। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমাদের ধারণা ছিল তিনি সত্যি-সত্যি বের হয়ে যাবেন এবং আর কোনট দিন ফিরে আসবেন না।

এরকম ধারণা হবার কারণ কি?

কোনোই কারণ নেই। বাবা সবসময় অচেনা জায়গায় যাবার কথা বলতেন, এই থেকে ছোটবেলাতেই আমাদের ধারণা হয়ে গেল বাবা একদিন-না-একদিন আমাদের ফেলে পালিয়ে যাবেন।

এইসব কথাতো আমাকে কখনো বল নি।

বলার মতো কিছু না। তাছাড়া এখন এই গল্প শুনতে ভালো লাগছে অন্য সময় ভালো লাগত না। সংসারের চাপে অস্থির হয়ে থাকলে কিছু ভালো লাগে না। কিছু শুনতে ইচ্ছা করে না।

বিরাট গোল একটা থালায় চায়ের কাপ সাজিয়ে একজন এসে ভরাট গলায় বলছে, চা লাগবে, চা?

তৌহিদ বলল, চা খাবে রিমি?

রিমি সন্ধ্যা মেলাবার পর কখনোচা খায় না। আজ বলল, খাব।

তৌহিদ বলল, চায়ের সঙ্গে আমি একটা সিগারেট খাই?

তৌহিদকে বিস্মিত করে রিমি বলল, খাও।

অন্য সময় এই চা ভালো লাগত না। পানসে ধরনের চা, লিকার হয় নি। চিনি দিয়ে শরবত বানিয়ে রেখেছে তবু খেতে ভালো লাগছে। চায়ের কাপে রিমি ছোট-ছোট চুমুক দিচ্ছে। প্রবল হাওয়ায় রিমির চুল উড়ছে। রিমিকে খুব সুন্দর লাগছে।

তৌহিদ বলল, বাবার খুব শখ ছিল সমুদ্র দেখার। কথায়-কথায় সমুদ্র যে কী বিশাল, কী সুন্দর এইসব বলতেন। বলার সময় তাঁর চোখ-মুখ অন্যরকম হয়ে যেত। কথার মাঝখানে সমুদ্র নিয়ে কী একটা কবিতাও বলতেন।

কি কবিতা?

মনে নেই। একটা লাইন ছিল—হে সমুদ্র, স্তব্ধচিত্তে শুনেছি গর্জন তোমার রাত্রিবেলা।

আহা! উনাকে একবার নিয়ে গেলেই হত। তোমরা পাঠালে না কেন?

আমাদের পাঠাতে হয় নিউনি নিজেই একবার রওনা হলেন। চিটাগাং পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলেন।

কেন?

এরকম অদ্ভুত সুন্দর একটা জিনিস তিনি একা দেখবেন, ছেলেমেয়েরা কেউ দেখবে না— এটা তাঁর ভালো লাগল না। ফিরে আসার পরপর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তার মাস দুএকের মধ্যে মারা গেলেন। তাঁর সমুদ্র দেখা হল না।

তৌহিদের গলার স্বরে কোনো গভীর দুঃখ প্রকাশ পেল না। সে খুব স্বাভাবিকভাবেই কথা শেষ করে অনিকে ঠিকমতো শুইয়ে দিল। বেচারীর সারারাত জাগার পরিকল্পনা ছিল, ঘুমিয়ে পড়েছে।

রিমি অনির ছোট বালিশটা নিয়ে এসেছে। এই বালিশ ছাড়া সে ঘুমুতে পারে না। সুটকেস খুলে বালিশ বের করে সে অনির মাথার নিচে দিয়ে দিল। শাশুড়ির দেয়া চাদরে গা ঢেকে দিল। হালকা গলায় বলল, ভৈরবের পুল এলে অনিকে ডেকে তুলতে হবে। বৈ যেতে কতক্ষণ লাগবে বল তো?

জানি না। অনেকদিন ট্রেনে উঠি না।

আচ্ছা, এরা কি সারারাত বাতি জ্বালিয়ে রাখবে? না ঘুমুবার জন্যে বাতি নেভাবে?

তাও তো জানি না।

ট্রেন তো কোথাও থামছে না। এটা কি কোথাও থামে না?

তৌহিদ বলল, কী জানি, ভৈরবে হয়ত থামবে। আমি আসলে কিছুই জানি না। জার্নিটা তোমার কেমন লাগছে রিমি?

ভালো।

শুধু ভালো? এর বেশি কিছু না?

খুবই ভালো।

এরকম চমৎকার জার্নি করেছ কখনো?

না।

রিমি জানালা দিয়ে মুখ বের করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। কারণ এই মুহূর্তে সে একটি মিথ্যা কথা বলেছে। মিথ্যা কথা বলার জন্যেই তার লজ্জা লাগছে। এরকম চমৎকার একটি ভ্রমণ সে এর আগেও একবার করেছিল। ময়মনসিংহ থেকে গিয়েছিল গৌরীপুর। কী অপূর্বই না ছিল সে ভ্রমণ। সারাক্ষণ মনে হচ্ছিল এই যাত্রা যেন শেষ না হয়। গ্রামগঞ্জ, পথ-মাঠ-ঘাট সব ছাড়িয়ে এই ট্রেন যেন চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। কত আবেগ,কত উত্তেজনায় ভরা সেই যাত্রা। আনন্দে সেদিন বারবার চোখে পানি এসে যাচ্ছিল। আজও পানি আসছে। অথচ দুটি ভ্রমণ কতই না আলাদা।

ঐ চাওয়ালা আবার এসেছে। ভারি গম্ভীর গলায় বলছে, চা লাগবে, চা?

তৌহিদ বলল, চা খাবে রিমি?

খাব।

বাহ্ চমৎকার। বাইরে কী দেখছ?

কিছু না। অন্ধকার দেখছি।

বাইরে অন্ধকার নেই। চাঁদ উঠেছে। গাছপালা, গ্রাম সব অস্পষ্টভাবে চোখে আসছে। যেন স্বপ্নদৃশ্য। স্বপ্নের মতই কোমল এবং রহস্যময়। রিমির চোখ ভেজা। কামরায় গাড়ি ভরা ঘুম-রজনী নিঝুম।

তূর্ণা নিশীথা ছুটে যাচ্ছে। ইঞ্জিনচালককে আজ বোধ হয় গতির নেশায় পেয়েছে। ক্রমেই গাড়ির গতি বাড়ছে। লাইন ছেড়ে গাড়ি ছিটকে বেরিয়ে যাবে না তো!

রিমি আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। চাঁদটাও গাড়ির গতির সঙ্গে তাল রেখে ছুটে যাচ্ছে। ছোটবেলায় এই ব্যাপারটা রিমিকে খুব বিস্মিত করত। সে যেখানেই যায় চাঁদটা তার সঙ্গে-সঙ্গে যায় কেন? খুব ছোটবেলায় সে তার বাবার সঙ্গে নৌকায় করে মোহনগঞ্জ থেকে বারহাট্টায় যাচ্ছিল। পূর্ণিমা রাত। সে অবাক হয়ে লক্ষ করল চাঁদটাও তাদের সঙ্গে-সঙ্গে যাচ্ছে। সে বিস্মিত গলায় বলল, বাবা, চাঁদটা আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে যাচ্ছে কেন?

রিমির বাবা বরকত সাহেব কঠিন গলায় বললেন, চুপ করে থাক। খালি কথা, খালি কথা। আর এইখানে বসে আছিস কেন? ছইয়ের ভেতরে যা। ফাজিল কোথাকার।

রিমি নৌকার ছইয়ের ভেতর চলে গিয়েছিল। সেরাতে উথালপাতাল চাঁদের আলোয় অপূর্ব দৃশ্যের সে কিছুই দেখে নি। তার শৈশব এবং কৈশোর আনন্দময় ছিল না। সেই সময়কার

কোনো আনন্দময় স্মৃতি তার নেই। কেউ যদি আজ তাকে বলে, তুমি কি তোমার শৈশব ফিরে পেতে চাও? সে বলবে, না।

তুমি কি কৈশোর ফিরে পেতে চাও?

না।

প্রথম যৌবনের কিছু দিন কি তোমাকে ফিরিয়ে দেব?

না।

অতীতের এমন কিছু কি আছে যা তুমি ফিরে পেতে চাও?

হ্যাঁ, চাই।

সেটা কী তুমি বল।

না, আমি বলব না।

ট্রেনের গতি কমে এসেছে। দুবার সিটি বাজাল ট্রেন ভৈরবের ব্রিজের উপর উঠছে। খটাং-খটাং শব্দ উঠছে। রিমি ব্যাকুল হয়ে অনির ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করছে। সে জেগে উঠে লম্বা ব্রিজটা দেখুক। তার শৈশবে কিছু আনন্দময় স্মৃতি যোগ হোক। সে যেন পরবর্তী সময়ে কখনো না বলে আমি আমার শৈশব ফিরে পেতে চাই না। কৈশোর ফিরে পেতে চাই না।

ও অনি ওঠত। মা ওঠত। দেখভৈরবের পুল দেখা ওঠমা ওঠ। লক্ষ্মী মা। এই অনি, অনি।

অনি জেগে উঠেই কান্না-কান্না গলায় বলল, আমি দাদীমার সঙ্গে ঘুমুব। আমি তোমাদের সঙ্গে ঘুমুব না।

সে বালিশটা হাতে নিয়ে বেঞ্চ থেমে নামার চেষ্টা করছে। রিমি বলল, মা এটা ট্রেন। বাসা না। এই দেখ আমরা ভৈরবের ব্রিজ পার হচ্ছিদেখ দেখা

অনি আবারো কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, দাদীমার সঙ্গে ঘুমুব।

৬. তারা কক্সবাজার পৌঁছল

তারা কক্সবাজার পৌঁছল দুপুর দুটায়।

তৌহিদ ভেবে রেখেছিল কোন একটা হোটেলে উঠবে। দামি হোটেল যেমন আছে, কমদামি হলেও নিশ্চয়ই আছে। প্রতিদিন এক শ বা দুশ টাকা দিয়ে থাকার মতো হোটেল নিশ্চয়ই আছে।

তৌহিদের হোটেল সমস্যার সমাধান হল নিতান্তই দৈবক্রমে। বাস স্টেশনে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, মাস্টার সাহেব না?

তৌহিদ তাঁকে চিনতে পারল না। তবু পরিচিত ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করল। ভদ্রলোক বললেন, বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

জ্বি।

আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?

জ্বি না।

আমার দুই ছেলেকে আপনি পড়িয়েছেন। শিমু আর হিমু।

ও আচ্ছা-আচ্ছা।

দুই জনেই ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল আল্লাহর রহমতে। অঙ্কে লেটার মার্ক ছিল। তৌহিদ কিছুই মনে করতে পারল না, তবে ভঙ্গি করল যে মনে পড়েছে। আমি এখানেই আছি। কৃষি ব্যাংকে। আপনারা উঠবেন কোথায়? কোনো একটা হোটেল-টোটেলে।

সার্কিট হাউসে উঠেন না কেন? আপনি সরকারি হাইস্কুলের এ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার, আপনার তো সার্কিট হাউসে থাকার রাইট আছে। এন ডি সি বললেই হবে। তাছাড়া এখন অফ সিজন, লোকজন নেই। সব খালি পড়ে আছে।

তৌহিদ বলল, দরকার নেই, ঝামেলা করে।

ঝামেলার তো কিছু নেই। একটা ডাবল সিটেড রুমের ভাড়া মাত্র যোল টাকা। আপনি খামাখা কেন তিন চার শ টাকা দেবেন।

তৌহিদ অসহায় ভঙ্গিতে রিমির দিকে তাকাল। সারাদিনের পরিশ্রমে তারা সবাই ভয়ানক ক্লান্ত। ইচ্ছা করছে দ্রুত কোনো একটা হটেলে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে। তাছাড়া অনির শরীর খারাপ করেছে। বাসে তিনবার বমি করেছে। ওদের রাস্তায় ফেলে রেখে সে যাবে সার্কিট হাউসের খোঁজে সার্কিট হাউস হচ্ছে রুইকাতলাদের থাকার জায়গা! সে নিতান্তই একজন স্কুল টিচার।

ভদ্রলোক বললেন, আপনার স্ত্রী এখানে বসে অপেক্ষা করুন। চা-টা খান। আপনি চলুন আমার সঙ্গে আমি এন ডি সি সাহেবের সঙ্গে কথা বলে একটা ব্যবস্থা করে দি।

বাদ দিন।

রিমি বলল, তুমি যাও না উনার সঙ্গে।

অনির শরীরটা খারাপ।

শরীর খারাপ, শরীর ঠিক হবে। কতক্ষণ আর লাগবে। যাও না।

নিতান্ত অনিচ্ছায় তৌহিদ গেল। অচেনা-অজানা জায়গায় রিমিকে ফেলে চলে যাচ্ছে—কিছু হবে না জানা কথা।

তৌহিদের আশংকা অমূলক প্রমাণিত হল। এন ডি সি সাহেব শুধু যে সার্কিট হাউসে একটা ঘরের ব্যবস্থা করলেন তাই না, একটা জিপ দিয়ে দিলেন সার্কিট হাউসে পৌঁছে দেবার জন্যে।

ঘরে ঢুকে রিমি বলল, বাহ্।

কার্পেট ঢাকা ঘরে পাশাপাশি দুটা খাট। বসার জন্যে গদি আঁটা চেয়ার, প্রশস্ত ক্লসেট। চমৎকার বাথরুম। একজন এ্যাটেনডেন্ট এসে গ্লাসে খাবার পানি দিয়ে গেল। বাথরুমে নতুন সাবান এবং তোয়ালে রেখে গেল।

তৌহিদ বলল, এখানে খাবার ব্যবস্থা আছে?

এ্যাটেনডেন্ট বলল, পাহাড়ের উপর যে সার্কিক হাউস আছে ওখানে সব ব্যবস্থা আছে। এটা নতুন, সব ব্যবস্থা নাই। তবে স্যার, আমরা টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার এনে দেব। নিচে ডাইনিং রুম আছে, এখানে খেতে পারেন।

আশেপাশে হোটেল নেই?

পর্যটনের একটা রেস্টুরেন্ট আছে। পানাহার। হেঁটে যাওয়া যায়।

খাবারের দাম বোধ হয় খুব বেশি।

জ্বি স্যার, একটু বেশি। তবে খাবার ভালো।

রিমি বলল, আমরা গোসল-টোসল করে ঐখানেই যাব। তুমি কি ভাই একটু চা খাওয়াতে পারবে?

জ্বি, পারব।

ছেলেটি মুহূর্তের মধ্যে চা নিয়ে এল। চমৎকার কাপ। সুন্দর টি-পট। রিমি মুগ্ধ হয়ে গেল। অনির শরীর মনে হয় এখন ভালো লাগছে। সে বারান্দার এ-মাথা থেকে – মাথা পর্যন্ত ছোটাছুটি করেছে।

রিমি চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে বলল, এত সুন্দর একটা ঘরের ভাড়া মাত্র ষোল টাকা! আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি ভেবেছিলাম প্রতিদিন দুশ আড়াই শ টাকা চলে যাবে ভাড়ায়।

অনি বলল, আমরা কখন সমদ্র দেখব মা?

খুব শিগগিরই দেখব।

আমি চা খাব মা।

অন্য সময় হলে রিমি মেয়েকে কখনো চা দিতে না। আজ দিল। খুশি-খুশি গলায়। বলল, ঐ ভদ্রলোক আমাদের খুব উপকার করলেন। ভাগ্যিস উনার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল। ভদ্রলোকের নাম কি?

নাম জানি না।

নাম জান না মানে? তুমি উনার নাম জিজ্ঞেস কর নি?

না।

আশ্চর্য মানুষ তো তুমি। এত উপকার করলেন আর তুমি ভদ্রলোকের নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলে না?

দেখা হবে নিশ্চয়ই তখন নাম জিজ্ঞেস করে নেব।

শুধু নাম জিজ্ঞেস করলেই হবে না। আমাদের সঙ্গে একবেলা চা খেতে বলবে।

আচ্ছা।

এরাতো মশারি দেয় নি। এখানে বোধহয় মশা নেই, তাই না?

হতে পারে। সমুদ্রের বাতাসে হয়তো মশা থাকে না।

তুমি আবার সিগারেট ধরাচ্ছ?

যাত্রায় নিয়ম নাস্তি রিমি।

তোমরা কী পাও সিগারেটে বল তো?

একটা টান দিয়ে দেখ না। দেখবে?

তৌহিদকে অবাক করে দিয়ে রিমি হাত বাড়াল—দাও। অনি হাততালি দিচ্ছে, তারস্বরে চেঁচাচ্ছে–মা সিগারেট খাচ্ছে। মা সিগারেট খাচ্ছে।

তারা সমুদ্র দেখতে বেরুল বিকেলে। রিমির খুব ঘুম পাচ্ছিল। ইচ্ছা করছিল মাথার উপরে ফুল স্পিডে ফ্যান ছেড়ে আরাম করে ঘুমায়। ঘুমুনোতো যেতেই পারে—এখন কোন দায়-দায়িত্ব নেই। ঘর গোছাতে হবে না, রাতে কী রান্না হবে তা নিয়ে ভাবতে হবে না, হঠাৎ লবণ ফুরিয়েছে—জিতু মিয়াকে লবণ আনতে পাঠাতে হবে না। নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুনো যায়। তবু রিমি বের হল অনির চাপাচাপিতে। সে এক্ষুনি সমুদ্র দেখবে।

তারা বেলাভূমিতে যখন পৌঁছল তখন সূর্য সমুদ্র স্পর্শ করেছে। সমুদ্রের একটি অংশ লাল, অন্য অংশটি গাঢ় নীল। ঢেউ বার-বার আছড়ে পড়ছে। ঢেউয়ের মাথায় দুধের মতো সাদা ফেনা।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত রিমি কথা বলতে পারল না। এই দৃশ্যের জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। যখন কোনো জিনিস কল্পনাকে বহুগুণে ছাড়িয়ে যায় তখন মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। মাথার ভেতর এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে। রিমির সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে। সে জানত বিশাল একটা কিছু দেখবে তবু সেই জানাতেও ফাঁক ছিল। সে যে এত বিশাল কিছু দেখবে তার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি তার ছিল না।

সে বিড়বিড় করে বলল, ভয় লাগছে।

তৌহিদ বলল, কিছু বলছ রিমি?

না।

কেমন লাগছে বল তো?

জানি না।

অনি ছুটে যাচ্ছে জল স্পর্শ করার জন্যে। ওকে ফেরানো দরকার। কে জানে হঠাৎ হয়ত বড় কোনো ঢেউ এসে তাকে নিয়ে যাবে। রিমি ছুটে যেতে পারছে না। মনে হচ্ছে তার পা বালিতে আটকে গেছে। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, অনিকে নিয়ে এস।

তৌহিদ বলল, যাক না। কিছু হবে না। দেখ না কত বাচ্চারা খেলছে। তোমাকে এমন লাগছে কেন? শরীরটা খারাপ করেছে?

না। তুমি অনিকে নিয়ে এস।

তুমিও আস দুজন একসঙ্গে যাই।

না। আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি অনিকে নিয়ে এস।

তৌহিদ এগিয়ে গেল। অনি মহানন্দে পানিতে ছোটাছুটি করছে। ঢেউ এসে এক একবার পায়ে আছড়ে পড়ছে—সে খিলখিল করে হেসে উঠছে। সমুদ্র সবার মনে এক ধরনের ভয় এবং শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তোলে, শুধু শিশুদের মনে জাগায় ভালবাসা। শিশুরা কখনো সমুদ্র ভয় পায় না।

তৌহিদ ডাকল, অনি এস।

অনি ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, না।

জামা ভিজে যাচ্ছে তো!

ভিজুক।

অসুখ করবে।

করুক।

তৌহিদের পাশে দাঁড়ানো মোটাসোটা ধরনের এক ভদ্রলোক বললেন, সমুদ্রের পানিতে ভিজলে অসুখ হয় না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তৌহিদ বেলাভূমির দিকে তাকাল। রিমি ঠিক আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়ানোর ভঙ্গি এবং তাকিয়ে থাকার ভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয় নি। শেষ সূর্যের আলো পড়েছে তার চোখে-মুখে। বাতাসে তার চুল উড়ছে। রিমিকে রক্তমাংসের কোনো মানবী বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সমুদ্রের মতোই প্রাচীন কোনো হিরন্ময় মূর্তি।

সূর্যাস্ত দেখতে ভিড় করা ভ্রমণবিলাসীরা ক্যামেরায় ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত। সূর্য ডুবে যাবার আগেই তাকে বন্দী করে ফেলতে হবে।

কয়েকটি অল্পবয়েসী তরুণী ভেজা বালিতে পায়ের ছাপ ফেলে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। সম্ভবত নিজেদের মধ্যে কোনো বাজি ধরেছে। কে কার আগে যেতে পারে।

হানিমুন করতে আসা দুজোড়া স্বামী-স্ত্রীকেও দেখা গেল। দুজন স্বামীর পরনেই সিকের পাঞ্জাবি। গা থেকে ভুরভুর করে সেন্টের গন্ধ আসছে। বিয়ের প্রথম কিছুদিন পুরুষদের সিকের পাঞ্জাবি এবং সেন্টের প্রতি খুব আগ্রহ দেখা যায়। এই দুজন নববিবাহিত যুবকের হাতেও ক্যামেরা—তবে তাদের ক্যামেরায় তারা সূর্যাস্তের ছবি তুলছে না। ছবি তুলছে তাদের স্ত্রীদের। এদের কাছে এই মুহূর্তে তাদের স্ত্রীর রহস্য সমুদ্রের রহস্যের চেয়েও বেশি।

কয়েকজন শিশু মজার একটা খেলা আবিষ্কার করেছে। ভেজা বালিতে একটু গর্ত খুড়লেই নিচ থেকে পানি এসে গর্ত ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এই আবিষ্কারে তারা মুগ্ধ ও বিস্মিত। এখন তারা বালি দিয়ে ঘরবাড়ি বানাচ্ছে, প্রতিটি বাড়ির পেছনে একটা করে পুকুর।

মাঝবয়েসী একজন ভদ্রমহিলাকে খুবই লজ্জিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। ভদ্রমহিলার স্বামী তাকে খুব ধমকামকি করছেন। উঁচু গলায় বললেন, পায়ের নিচ থেকে স্যান্ডেল সমুদ্র কী করে নিয়ে যায় এই জিনিসটাই তো বুঝলাম না। তোমরা এত কেলাস। এক পার্টি স্যান্ডেল শুধু-শুধু পায়ে পরে আছ কেন? এইটাও ফেলে দাও। তোমাদের নিয়ে কোথাও বের হওয়াই যন্ত্রণা। বেকুবের মত চলাফেরা। লজ্জায় এবং অপমানে ভদ্রমহিলার চোখে পানি এসে গেছে। তিনি প্রাণপণে সেই পানি আড়াল করার চেষ্টা করছেন।

তিনটি যুবতী মেয়ে এই সন্ধ্যাবেলায় স্নান করতে নেমেছে। তাদের সঙ্গে আছে দুজন পুরুষ। তারা একজন অন্যজনের উপর যেভাবে গড়িয়ে পড়ছে তা ঠিক শোভন নয়। অনেকেই সূর্যাস্ত বাদ দিয়ে এই দৃশ্যই খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছে। এদের মধ্যে দুজন প্রৌঢ়ও আছেন। এদের চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে এরা নিজেদের ঐ দুজন যুবকের জায়গায় কল্পনা করছেন।

একজন যুবক শ্যামলা মতে যুবতীটিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সুমদ্রের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। যুবতীটি দুহাত ছুঁড়ে চেঁচাচ্ছে-ভালো হবেনা বলছি। ভালো হবে না বলছি। তখন একটি ঢেউ এসে এদের ডুবিয়ে দিল। ঢেউ সরে যাবার পর ওরা দুজন আবার উঠে দাঁড়াল। দেখা গেল, দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে আছে। মেয়েটি হাসছে। খিলখিল করে।

যে দৃশ্য অন্য সময় কুৎসিত মনে হত, সমুদ্রের কারণে তা মনে হচ্ছে না। সুমদ্র অসুন্দরকে সুন্দর করতে পারে।

চকচকে লাল রঙের গেঞ্জি গায়ে একটি আট নবছর বয়েসী ছেলেকে উবু হয়ে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় বালির দিকে। বালিতে ছোট-ছোট ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে হুস করে লাল কাঁকড়া বের হয়ে আসছে। ছেলেটি চমকে উঠে গোঁগোঁ ধরনের শব্দ করছে। মনে হয় সে লাল কাঁকড়াগুলোকে খুব ভয় পাচ্ছে, তবু সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছে না।

সমুদ্রে সন্ধ্যা খুব তাড়াতাড়ি নামে। সূর্য ডুবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই অন্ধকার হয়ে গেল। এই বিপুল জলরাশির এক ধরনের প্রভা আছে। সেই প্রভায় সমুদ্র জ্বলছে অন্ধকার নামছে চারদিকে।

রিমি এখন আগের জায়গায়, তবে সে দাঁড়িয়ে নেই, বসেছে। তৌহিদ অনিকে নিয়ে ফিরেছে। অনি ঢেউয়ের ধাক্কায় উলটে পড়ে লোনা পানি গিলে বমি করে ফেলেছে। তার হাত-মুখ ধোয়ানো দরকার। তৌহিদ বলল, চল যাই। অনির মুখ ধেয়াতে হবে। কয়েকটি রেস্টুরেন্ট আছে, ঐখানে হাত-মুখ ধুইয়ে দি।

রিমি ক্লান্ত গলায় বলল, তুমি ওকে নিয়ে যাও। আমি খানিকক্ষণ বসি।

এই অন্ধকারে একা-একা বসে থাকবে?

একা কোথায়, কত মানুষ ঘুরছে!

চল আমার সঙ্গে, পরে নাহয় আবার এসে বসব।

না।

রিমির গলায় এই না খুব কঠিন শোনা। কিংবা সে হয়ত নিজের মতো করেই বলেছে, শোনাচ্ছে অন্যরকম।

সমুদ্রের ধার ঘেঁষে এক সারি ইলেকট্রিক বাতি জ্বলে উঠেছে। বাতি জ্বলছে সৈকত পুলিশের গোলাকার ঘরে। উত্তর দিকে পাহাড়ের উপর জোরাল সার্চ লাইট জ্বলছে। বাতি ঘুরে-ঘুরে জ্বলছে।

সমুদ্র এখন প্রবল গর্জন করছে। হুমহুম শব্দ উঠছে। যেন ক্ষণে ক্ষণে সে তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। বার-বার বলছে, আমি আছি, আমি আছি।

রিমি একা-একা বসে আছে। সূর্যাস্ত দর্শনধারীদের প্রায় সবাই চলে গেছে। অল্প কিছু লোকজন আছে—তারা ঘুরছে জলের আশেপাশে। কোন বিচিত্র কারণে। রিমির মন অসম্ভব খারাপ হয়েছে। কান্না আসি-আসি করছে। গলার কাছে ব্যথা বোধ করছে।

আমি অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছি, আপনি একা বসে আছেন। একা বসে থাকার জন্য জায়গাটা নিরাপদ নয়।

রিমি চমকে পেছনে ফিরে তাকাল। চশমাপরা রোগা একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। রিমি উঠে দাঁড়াল। ভদ্রলোক বললেন, আশা করি আপনি আমাকে ভয় পাচ্ছেন না? আপনার স্বামী এবং মেয়েটি কোথায়, ওদের তো দেখছি না।

রিমি জবাব দিল না। অপরিচিত এই ভদ্রলোকের কৌতূহল তার ভালো লাগছে না। গায়ে পড়ে কথা বলতে আসার কী মানে?

আপনারা তো সার্কিট হাউসে উঠেছেন। আমি এবং আমার স্ত্রী ঐখানেই আছি চার নম্বর কামরায়। বিকেলে আপনাদের বের হতে দেখেছি। এই পরিচয়ের দাবিতে কথা বলতে এসেছি। একা-একা বসে আছেন কেন?

রিমি এখনো জবাব দিল না। তবে তার মুখের কাঠিন্য কিছুটা কমে এল। ভদ্রলোক বললেন, এখানে কিছু দুষ্ট ছেলেপুলে আছে। পরশু সন্ধ্যায় এক ভদ্রমহিলার ব্যাগ নিয়ে ছুটে পালিয়েছে। আপনার স্বামী কোথায়?

ঐ রেস্টুরেন্টে গিয়েছে।

আপনিও চলুন। আপনাকে আপনার স্বামীর কাছে দিয়ে আসি।

রিমির একবার ইচ্ছা হল বলে, আমাকে আমার স্বামীর কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত কেন? কিন্তু সে কিছু না বলে সঙ্গে-সঙ্গে আসতে লাগল।

রিমি ভেবেছিল হাঁটতে-হাঁটতে হড়বড় করে এই লোক প্রচুর কথা বলবে। ভাব জমানো ধরনের কথা। এক ধরনের মানুষ আছে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সামান্যতম সুযোগও ছাড়ে না। মেয়েদের শরীরের সামান্যতম স্পর্শের জন্যেও ভূষিত হয়ে থাকে। রিমি কিছুটা বিস্মিত হল। কারণ এই ভদ্রলোক সারাপথে একটি কথাও বললেন না। দোকানগুলোর উজ্জ্বল আলোর কাছে এসে শুধু বললেন, ঐ যে ওদের দেখা যাচ্ছে। আপনি যান।

রিমি লক্ষ করল ভদ্রলোক আবার সমুদ্রের কাছে ফিরে যাচ্ছেন। রিমির মনে হল এই ভদ্রলোককে আপনাকে ধন্যবাদ জাতীয় কিছু বলা উচিত ছিল। বলা হল না। তার মনটা একটু খচখচ করতে লাগল।

অনি ঝিনুকের একগাদা জিনিস কিনেছে। বিকট-দর্শন শুকনো কাঁকড়া মাছের মতো কী একটা কিনেছে যার লেজ সুতীক্ষ্ণ সুচের মতো। হাঙ্গরের একটা দাঁত কিনেছে। আরেকটা কিনতে চায় দাদীমার জন্যে। তৌহিদ মেয়েকে বুঝানোর চেষ্টা

করছে, একদিনে সব কিনে ফেললে কীভাবে হবে। আমরা তো আবার আসব।

না এক্ষুনি কিনব।

ঝিনুকের দোকানী বলল, স্যার একটা শংকর মাছের লেজ দিয়ে বানানো চাবুক নিয়ে যান।

তৌহিদ বলল, চাবুক দিয়ে কী করব?

মারামারি করবেন।

তৌহিদ বিস্মিত হয়ে বলল, কার সঙ্গে মারামারি করব? দোকানী দাঁত বের করে হাসছে। তৌহিদ বুঝল এটা এই দোকানীর একটি প্রিয় রসিকতা। অনেককেই সে হয়ত বলেছে মারামারি করার জন্যে একটা চাবুক নিয়ে যান।

তৌহিদ বলল, চাবুকের দাম কত?

৭. অনি ঘুমুচ্ছে

অনি ঘুমুচ্ছে।

রাত মাত্র নটা। অথচ মনে হচ্ছে নিশুতি। ঢাকার বাইরে গেলেই রিমির এমন হয়। নটা-দশটা বাজতেই মনে হয় মাঝরাত।

অনিকে একটা খাটে শোয়ানো হয়েছে। অন্য খাটটিতে রিমি এবং তৌহিদ শোবে। তৌহিদ বলল, দুজন এই খাটে ধরবে না। আমি নির্ঘাৎ গড়িয়ে পড়ে যাব। এরচে বরং কার্পেটে শোয়া যাক। চাদর বিছিয়ে বিছানা কর।

রিমি হ্যাঁ-না কিছু বলল না। মনে হয় তার মত আছে। মত না থাকলে কঠিন গলায় না বলত। না শব্দটা এম্নিতেই খারাপ। সেই খারাপ শব্দটা কোমল গলায় বলা উচিত। রিমি তা বোঝে না।

দরজায় টোকা পড়ছে। রিমি দরজা খুলল, সার্কিট হাউসের এ্যাটেনডেন্ট। একদিনের পরিচয়েই সে হাসিমুখে ঘরের লোকের মতো জিজ্ঞেস করল, আপা কিছু লাগবে?

রিমি বলল, তোমাদের মশারি নেই? মশারি দেবে না?

মশা তো আপা নেই। তবু যদি বলেন; মশার ওষুধ স্প্রে করে দেব?

থাক দরকার নেই। উনার শ্বাসকষ্ট আছে। মশার ওষুধের গন্ধ সহ্য করতে পারবেন না।

চা দেব আপা? চা খাবেন?

উনাকে এক কাপ দাও। উনি শোবার আগে চা খান। আচ্ছা, আমাকেও দিও।

তৌহিদ হাসিমুখে বলল, তোমার চা খাওয়াটা ঠিক হবে না। রাতের ঘুম নষ্ট হবে।

হোক। চল বাইরে বসি। বাইরে বসার চেয়ার দিয়েছে।

দুজনেই বারান্দায় চলে এল। তৌহিদের ঘুম পাচ্ছে। শেষ চা-টা খাবার জন্যে জেগে আছে। রিমিকে দেখে মনে হচ্ছে তার ঘুম পাচ্ছে না। সমস্ত দিনের ক্লান্তির কিছুই তার চোখে নেই। তৌহিদ চেয়ারে বসতে-বসতে বলল, এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় না। এরা সার্কিট হাউসটা উল্টো করে বানিয়েছে। আমরা বসেছি সমুদ্রের দিকে পিঠ দিয়ে।

রিমি কিছু বলল না। তাকে এখন কিছুটা বিষণ্ন বলে মনে হচ্ছে।

তৌহিদ বলল, চুপচাপ বসে আছ কেন? কথা বল।

কথা বললেই তোমার সঙ্গে ঝগড়া হবে। কাজেই চুপচাপ বসে আছি।

ঝগড়া হবে কেন?

ঝগড়া হবে কারণ তুমি ফ্লাটা বাসে ফেলে এসেছ। ফ্লাটা সারাক্ষণ তোমার সঙ্গে ছিল। নামার সময় তুমি নামলে ফ্লাস্ক ছাড়া।

বাদ দাও।

রিমি হাসিমুখে বলল, বাদ দিলাম।

তৌহিদ একটা হাত রিমির কোলে রাখল এবং সঙ্গে-সঙ্গে সরিয়ে নিল। ছেলেটা চা নিয়ে আসছে।

চা-টা ঠাণ্ডা। পানসে ধরনের। তবু রিমি ছোট-ছোট চুমুক দিয়ে খাচ্ছে। তার খাওয়া দেখে মনে হয় তার বেশ ভালো লাগছে। রিমি বলল, আমাদের পাশের কামরায় যে ভদ্রলোক থাকেন তার সঙ্গে কি তোমার কথা হয়েছে?

না, কেন বল তো?

এম্নি জিজ্ঞেস করছি। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। আমি একা-একা সমুদ্রের পাশে বসেছিলাম, ভদ্রলোক আমাকে এগিয়ে দিলেন।

তৌহিদ সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বলল, আমি আগ বাড়িয়ে কখনো কথা বলি না। কথা বললেই এক সময় বের হয়ে যাবে আমি একজন স্কুল মাস্টার। স্কুল মাস্টারদের সম্পর্কে লোকজনদের ধারণা ভালো না।

লোকজনদের কী ধারণা?

বেশিরভাগ মানুষেরই ধারণা, এরা কিছুই জানে না। এক দঙ্গল ছাত্র পড়ানোর বাইরে এদের কোনো জগৎ নেই। বদমেজাজি শুকনো রসকষহীন মানুষ।

ধারণা কি ভুল?

না ভুল না। ঠিকই আছে।

চা শেষ করার পরেও তারা অনেকক্ষণ বাইরে রইল। তৌহিদ একটা হাত রাখল রিমির কোলে। নরম গলায় বলল, বেশ লাগছে, তাই না?

হুঁ।

প্রতিবছর একবার করে আসতে পারলে চমৎকার হত।

তা হত।

এখন থেকে বেড়ানোর জন্যে আলাদা করে টাকা জমাব, কি বল রিমি?

জমিও। ম্যাট্রিক পরীক্ষার খাতা দেখার টাকাগুলো আলাদা করে রাখলেই কিন্তু হয়।

চল শুয়ে পড়ি।

তোমার ঘুম পাচ্ছে?

হুঁ।

আর একটু বস। ঘুমে আমার নিজের চোখ জড়িয়ে আসছিল। এখন কেন জানি ঘুমটা কেটে গেছে। খানিকক্ষণ বস। গল্প করি। আমরা এইভাবে বসে কখনো তো গল্প করি না। তুমি কথা বল—আমি শুনি।

কি কথা বলব?

যা ইচ্ছা বল। নিজের কথা বল। বাবা-মার কথা বল। বা তোমার ছেলেবেলার কথা। তোমার যা ভালো লাগে। নিজের কোনো কথাই তো তুমি আমাকে বল না।

বলার মত কিছু নেই।

নিজের কথা কিছু বলতে ইচ্ছা করে না। আমার শৈশব খুব কষ্টে কেটেছে। আমার চার বছর বয়সে মা মারা গেলেন। বাবা আবার বিয়ে করলেন। সেই সমার ছিল মাথা খারাপ। বিয়ের পর সেটা ধরা পড়ল। উদ্ভট সব পাগলামি করতেন। আমাদের আদর করতেন আবার মাছ কাটা বঁটি দিয়ে কেটে দুটুকরা করতে চাইতেন।

বল কী।

ভয়াবহ অবস্থা। মার হাতে একটা বঁটি আর আমরা বোনরা ভয়ে আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে ছুটাছুটি করছি এটা ছিল খুব কমন দৃশ্য। মা বঁটি দিয়ে আমার বড়ববানের পায়ে একটা কোপ বসিয়েও ছিলেন। এই যন্ত্রণা অবশ্যি আমাদের বেশি দিন সহ্য করতে হল না। বাচ্চা হতে গিয়ে মা মারা গেলেন। বাবা আবার বিয়ে করলেন।

বাদ দাও। আমার এসব গল্প করতে ইচ্ছা করছে না। চল যাই ঘুমুই। ঘুম পাচ্ছে।

চায়ের কাপ তো নিতে এল না।

ভেতরে নিয়ে রেখে দেব। সকালে নেবে।

বিছানা কার্পেটের ওপরই হল। কার্বাডে কম্বল ছিল। সেই কম্বল বিছিযে তার ওপর চাদর দিয়ে দেয়া হল। তৌহিদ শুতে-শুতে বলল, আরামে বিছানা হয়েছে। সে তার স্ত্রীর পায়ের উপর পা তুলে দিয়েছে। এটাই তার ঘুমানোর স্বাভাবিক ভঙ্গি।

কিছুক্ষণে মধ্যেই তার নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল। রিমির ঘুম এল আরো অনেক পরে। সেই ঘুমও খুব গাঢ় নয়। এলোমেলো সব স্বপ্নে ঘুম ঠাসা। সেই সব স্বপ্নেরও কোন আগা-মাথা নেই। তবে শেষরাতের স্বপ্নটা সে খুব পরিস্কার দেখল। এত পরিষ্কার যে মনে হয় এটা আসলেই ঘটছে।

সে দেখল তার শাশুড়ি জোবেদা খানম কক্সবাজার সার্কিট হাউসের এই ঘরে এসেছেন। তিনি অসম্ভব বিরক্ত। চোখ কুঁচকে আছে রাগে। তিনি ঝাঁঝাল গলায় বললেন, এসব কী হচ্ছে বৌমা?

কিসের কথা বলছেন মা?

মাটিতে শুয়ে আছ কেন? খাট থাকতে মাটিতে শুয়ে থাকা এটা আবার কোন ঢং?

মাটি কোথায় মা? কার্পেটের ওপর শুয়েছি। তার ওপর কম্বল আছে। এই দেখুন না।

আর মেয়েটাকে মশারি ছাড়া ফেলে রেখেছ। মশা তো খেয়ে ফেলছে। মেয়েটাকে।

সমুদ্রের পাড়ে মশা থাকে না মা। হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায়।

এইসব ঢং-এর গল্প আমার সঙ্গে করবে না তো মা। ঢং-এর গল্প আমার। ভালো লাগে না। উঠে দেখ মশা মেয়েটাকে ছিলে ফেলেছে।

রিমি উঠে বসল। এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল এই ধারণা মনে আসতেও তার . অনেক সময় লাগল। স্বপ্ন এত স্পষ্ট হয়। এত গোছানো হয়।

মনে হচ্ছে সত্যি-সত্যি তার শাশুড়ি এসেছিলেন। রিমি মেয়ের খাটের কাছে গেল। সত্যি-সত্যি বেশ কয়েকটা মশা রিমিকে ছেকে ধরেছে। রক্ত খেয়ে এক-একটা ফুলে কোলবালিশ হয়ে আছে। আহারে বেচারাকালই মশারির ব্যবস্থা করতে হবে। এদের না। থাকে তো একটা কিনে ফেলতে হবে। এম্নিতেই একটা মশারি কেনা দরকার। ওদেরটায় অনেকগুলো ফুটো।

রিমি জানালা খুলে দিল। ঘরে আলো আসুক। আলো এলে মশা থাকবে না। তেমন আলো ঢুকল না। কারণ অন্ধকার পুরোপুরি কাটে নি। রিমি ঘরের বাতি জ্বলে দিল। নিজে মুখ ধুয়ে তৌহিদের ঘুম ভাঙাল। ভোরবেলা একসঙ্গে সমুদ্র দেখতে যাবে। অনির ঘুম ভাঙাল না। সে আরো খানিকক্ষণ ধুমুক। তৌহিদের বাথরুমে অনেক সময় লাগে।

রিমি দরজা খুলে বারান্দায় এসেই হকচকিয়ে গেল। ওরা গতরাতে যে চেয়ারে বসেছিল সেখানে বুড়ো এক ভদ্রলোক বসে আছেন। বুড়ো ভদ্রলোকের পরনে হাফপ্যান্ট। গায়ে চক্রাবা শার্ট। সমানে পাইপ টানছেন। রিমিকে দেখে নাটকীয় ভঙ্গিতে মাথা ঝুকিয়ে বললেন, গুড মর্নিং ম্যাডাম।

রিমি কী বলবে ভেবে পেল না। বুড়ো ভদ্রলোক মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে নিয়ে বললেন, লেট মি ইট্রডিউস মাইসে। আমি রিটায়ার্ড জাজ সিরাজুল ইসলাম। তুমি কে? তুমি করে বলার অপরাধ আশা করি ক্ষমা করবে। বয়সের সুযোগ গ্রহণ করছি।

হা-হা-হা।

আমার নাম রিমি।

মিস না মিসেস?

মিসেস।

মিসেস রিমি, তুমি যে একজন অসাধারণ রূপবতী মহিলা এই কথাটা নিশ্চয়ই আগে অনেকবার শুনেছ। তবু এই বৃদ্ধের মুখ থেকে আরেকবার শোন।

রিমি লজ্জা পেয়ে গেল। রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট জাজ সিরাজুল ইসলাম হড়বড় করে কথা বলতে লাগলেন।

সারা বারান্দায় কোথাও চেয়ার নেই। তোমাদের এখানে চেয়ার দেখে এসে বসলাম। আমি আমার নাতি-নাতনিদের জন্যে অপেক্ষা করছি। ওরা সমুদ্রে যাওয়ার জন্যে সাজসজ্জা করছে। কতক্ষণ লাগবে কে জানে। আটাত্তর বছর বয়সেও আমি সবকিছুতে ফার্স্ট আর ওরা লাস্ট। হা-হা-হা। তুমি কি বসবে? বস এই চেয়ারটায়।

রিমি সহজ গলায় বল, আমি বসব না। আপনি বসুন। জাজ সাহেবদের পাশে বসতে আমার ভয় করে।

ভদ্রলোক মনে হল এই কথায় খুব লজ্জা পেলেন। হা-হা করে খানিকক্ষণ হেসে রিমির হাত ধরে পাশের চেয়ারে বসালেন। রিমির মনে হয়, এই যে নিতান্ত অপরিচিত একটি মেয়েকে উনি হাত ধরে পাশে বসালেন, এ কাজটা ঢাকায় তিনি নিশ্চয়ই করতেন না। এরকম উদ্ভট সাজপোকও করতেন না। সমুদ্রের হাওয়া হয়ত মানুষের মধ্যে খানিকটা পাগলামি ঢুকিয়ে দেয়।

মিসেস রিমি?

জ্বি।

তোমার স্বামীটি কি এখনো ঘুমুচ্ছে?

জ্বি না; জেগেছেন। হাত-মুখ ধুচ্ছেন।

দ্যাটস নাইস। তাকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে চল। একসঙ্গে সমুদ্র দেখব।

বেশ তো, চলুন।

আমি আবার বিরাট দলবল নিয়ে ঘুরতে পছন্দ করি। এখন দলের সদস্যসংখ্যা এগার। তোমরা দুজন এলে হবে তের। আনকি থারটিন।

আমার সঙ্গে আমার মেয়ে আছে।

বাঁচা গেল। আনলাকি থারটিন আর হতে হল না। এখন আমরা লাকি ফোর্টিন।

আগামীকাল আমরা যাব মহেশখালি। এখানকার ওয়াটার ডেভলপমেন্ট বোর্ডর। একটা সমুদ্রগামী জাহাজ আছে। ওরা ঐটি আমাদের একদিনের জন্যে ছেড়ে দিয়েছে। দুপুরের খাওয়াদাওয়া জাহাজেই হবে।

তোমার সঙ্গে তাহলে কাল সারাদিনের প্রোগ্রাম সেটেল করলাম। মনে থাকবে?

রিমি হাসিমুখে বলল, থাকবে।

ভেরি গুড। এই দেশে আসলে সত্যিকার অর্থে দেখার কিছু নেই। গত সামারে আমি আমার বড় ছেলের কাছে গিয়েছিলাম সিয়াটলে, অসাধারণ। যেমন প্রকৃতি তেমনি তার রক্ষণাবেক্ষণ। আমেরিকানদের কারবারই অন্যরকম। ইউরোপ দেখা হয়। নি। ইটালিতে আমার ছোট মেয়ে আছে। হাসবেন্ত আই স্পেশালিস্ট। আমাকে যেতে বলেছে। সামনের সামারে যাবার ইচ্ছা।

আপনার তো খুব মজা। ঘুরেঘুরে বেড়াচ্ছেন।

তা ঠিক। রিটায়াড় জীবন উপভোগ করার চেষ্টা করছি। অনেকে তা করে না। ভালো কথা, তোমার হাসবেন্ড কী করেন তাতো জানা হল না।

উনি মাস্টারি করেন। স্কুল টিচার।

স্কুল টিচার?

জাজ সাহেবের মুখ হঠাৎ একটু পানসে হয়ে গেল। মনে হল তিনি একটা ধাক্কা খেলেন। রিমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

একেবারে শেষপ্রান্তের ঘর থেকে পুতুলের মত একটি মেয়ে বের হয়ে বলল, গ্রান্ডপা, এস আমরা রেডি। জাজ সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, দেখি ওরা কদ্র কী করেছে।

বুড়োভদ্রলোক দলবল নিয়ে নিচে নামলেন। তৌহিদ তখন বারান্দায়। জাজ সাহেব তাঁর দল নিয়ে দোতলা থেকে একতলায় নামছেন। তিনি একবারও তৌহিদের দিকে ফিরে তাকালেন না।

তৌহিদ বলল, এই বুড়ো ভদ্রলোক কী অত পোশক পরেছেন দেখেছ? রিমি জবাব দিল না। তার কান্না পাচ্ছে। নিজেকে বড়ই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে।

তৌহিদ বলল, অনিকে ডেকে তোল, চল যাই সমুদ্রে পা ভিজিয়ে আসি।

রিমি ক্লান্ত গলায় বলল, চল।

সমুদ্রের কাছে এসে রিমির মন বুড়িয়ে গেল। তার কাছে মনে হল ঐ জাজ সাহেব যত। বড়ই হোন তিনিও অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। সমুদ্র সব মানুষকে এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

এখন জোয়ারের সময়।

সমুদ্র ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। আকাশে মেঘ জমেছে বলেই সমুদ্রকে যেন কালো দেখাচ্ছে। কালো জলের মাথায় হঠাৎ-হঠাৎ সাদা ফেনার ফুল ফুটেই আবার মিলিয়ে, যাচ্ছে। কী অসম্ভব সুন্দর।

অধিকাংশ মানুষই এই সৌন্দর্য উপেক্ষা করে ঝিনুক কুড়াচ্ছে। শিশুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বয়স্ক মানুষ। একটা জীবন্ত তারা মাছ বালির উপর ভেসে উঠেছে। তাকে ঘিরে একদল কৌতূহলী মানুষ। একটি বাচ্চা ছেলে মাকে জিজ্ঞেস করল, মা, তারা মাছ কি আমরা খাই?

মা ছেলেটির গালে ঠাস করে একটা চড় বৃসিয়ে দিয়ে বললেন, গাধা, সব জায়গায় গাধামি করে। স্টার ফিস তোক কখনো বেঁধে দিয়েছি যে জিজ্ঞেস করছিল?

লজ্জায়, অপমানে ছেলেটির চোখে পানি এসে গেল। সমুদ্র বোধহয় তা টের পেল। ছেলেটির মা সমুদ্রে নামামাত্র প্রবল একটা ঢেউ এসে মাকে উল্টে ফেলে দিল। তীরে দাঁড়ানো সবাই হেসে উঠল হো-হো করে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ছোটে-ছোট জাল নিয়ে প্রচুর জেলে নেমেছে সমুদ্রে। তারা ধরছে চিংড়ি মাছের। পোনা। একেকটা পোনা তারা এক টাকা করে বিক্রি করবে। আজ জেলেদের ভাগ্য ভালো—প্রচুর পোনা ধরা পড়ছে।

স্নানের পোশাক পরা দুজন বিদেশিনী পানিতে নেমেছে। এদের অসম্ভব সাহস। এরা অনেক দূর চলে গেছে। হাত-পা ছড়িয়ে তারা নানা ভঙ্গিমায় পানির উপর নাচানাচি করছে। ওদের সঙ্গের পুরুষ দুজন পানিতে নামে নি। ভেজা বালুতে বসে বর্মী চুরুট টানছে এবং হাসাহাসি করছে। মেয়ে দুটি যে এত দূরে চলে গেছে তা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

শুধু রিমির কেন জানি প্রচণ্ড ভয় করছে। মনে হচ্ছে-একটা বড় ঢেউ উঠে এসে মেয়ে দুটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

একজন ভদ্রলোককে দেখা গেল গলা ফুলিয়ে পাশের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তর্ক করছেন, আরে ভাই আমি তো না জেনে বলছি না। জেনেশুনেই বলছি। ভদ্রলোকের নাম হিরাম কক্স। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন ক্যাপটেন ছিলেন। তার নামানুসারে কক্সবাজারের নাম করা হয়।

আপনি কিছুই জানেন না। কসাহেব ছিলেন একজন ব্রিটিশ আইসিএস। তিনি এই জায়গা ঘুর করতে এসে নাম দেন কক্সবাজার, আগে এই জায়গার নাম ছিল বালু। বালু একটা বার্মিজ শব্দ, যার অর্থ নীল পানি।

দয়া করে এইসব আজগুবি কথা বলবেন না-তো।

আপনি দয়া করে ইতিহাস কপচাবেন না।

বাঙালি নিজের প্রেজেন্ট জানে না, পাস্ট নিয়ে চেঁচামেচি করে। আগে জানবেন প্রেজেন্ট, তারপর পাস্ট।

আপনি কিন্তু ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

আর আপনি মূর্খামির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

শাট আপ।

ইউ শাট আপ।

রিমি অবাক হয়ে ওদের ঝগড়া শুনছে। দুজন বয়স্ক মানুষ শিশুদের মধ্যে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে? তাও সমুদ্রের কাছে এসে? এর কোন মানে হয়?

রিমির ঠিক গায়ের ওপর একটা পাজেরো জিপ হস করে থামল। ড্রাইভারের পাশে বসা মানুষটা নেমে এসে হাসি হাসি গলায় বলল, চিনতে পারছেন?

রিমি বলল, পারছি।

বলার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না চিনতে পারছেন। বলেন তো কে?

কাল রাতে আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে।

রাইট। রাতে আপনি এমন একটা ভঙ্গি করলেন যাতে মনে হল আপনি আমাকে খারাপ ধরনের ভিলেন ভেবে বসে আছেন। এইটা আপনার মেয়ে।

জ্বি। অনি, স্লামালিকুম দাও।

অনি বলল, আমি কাউকে স্লামালিকুম দিতে পারব না। ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, আপনার স্বামী কোথায়?

ঐ যে।

যান আপনার স্বামীকে ডেকে নিয়ে আসুন আপনাদের হিমছড়ি দেখিয়ে আনি। সরকারি গাড়ি পাওয়া গেছে।

রিমি অস্বস্তির সঙ্গে বলল, দরকার নেই। আমরা সমুদ্রের কাছেই থাকব। অন্য কোথাও যাব না।

আপনাদের কোথাও যেতে হবে না। সমুদ্রের কাছেই থাকতে পারবেন। আমরা তীর ঘেঁষে-ঘেঁষে যাব।

না থাক।

আপনার অস্বস্তির কারণটা বুঝতে পারছি না। আপনি কি এখনো আমাকে ভিলেন ভাবছেন?

না।

আচ্ছা আমি আপনার স্বামীর সঙ্গে কথা বলছি। উনাকে দেখে মনে হচ্ছে উনি আপনার মতো এত কঠিন না। ভালো কথা, উনি কী করেন জানতে পারি? প্রফেশানটা আগে জানা থাকলে আলাপ জমাতে সুবিধা হয়।

উনি একজন স্কুল টিচার।

তাই নাকি? আমার বাবাও স্কুল টিচার ছিলেন। তাঁর ভয়ে আমরা থরথর করে কাঁপতাম। শুধু যে আমরা তাই আমার মা, খালা সবাই। আপনার স্বামী আশা করি তেমন ভয়ংকর না।

রিমি হেসে ফেলল। তার মনে একগাদা বালি জমে খচখচ করছিল। সমুদ্রের একটা বড় ঢেউ এসে সব ধুয়ে নিয়ে গেল।

জিপ দ্রুতগতিতে চলছে। মাঝেমাঝে ছুটছে হাতখানিক পানির ওপর দিয়ে। অনির বিস্ময়ের সীমা নেই। সে একটু পরপর বলছে, আমাদের এই গাড়ি জাহাজের মতে, তাই না বাবা? পানির ওপর দিয়ে যেতে পারে।

রিমির এই ভদ্রলোককে বেশ ভালো লাগল। তাঁর নাম জামাল হোসেন। বয়স পঞ্চাশের ওপর, দেখায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। সিএসপি অফিসার। সরকারি কাজে এসেছেন। কাজ শেষ করেছেন। আগামীকাল ভোরে চলে যাবেন।

জামাল হোসেন বললেন, লোকজন হিমছড়িতে আসে খুব আগ্রহ নিয়ে। ভাবে বিশাল একটা জলপ্রপাত দেখবে। গিয়ে দেখে ছোট্ট একটা পানির ধারা। দেখে মনে হয় উঁচু পাহাড়ের মাথায় কেউ একটা পানির ট্যাপ খুলে দিয়েছে। তবু লোকজন আসে। হতাশ হওয়ার জন্যে আসে। অবশ্যি পুরাপুরি হতাশ হয় না।

হতাশ হয় না কেন?

হিমছড়িতে আসার পথে দীর্ঘ বেলাভূমি চোখে পড়ে। এই বেলাভূমির সৌন্দর্যের তো কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, তাই না?

রিমি বলল, হ্যাঁ নাই। এত সুন্দর যে মন খারাপ হয়ে যায়।

আসলেই তাই। পৃথিবীর সব সুন্দর জিনিসের সামনে দাঁড়ালেই মন খারাপ হয়। এটা মানুষের বেলায়ও সত্যি। আমার প্রথম স্ত্রী খুব রূপবতী ছিল। সে এতই সুন্দর ছিল। যে তার দিকে তাকালেই মন খারাপ হয়ে যেত।

উনি কি মারা গেছেন?

হ্যাঁ। বিয়ের দুবছরের মাথায় চাইল্ড বার্থে। সেও বাঁচে নি। বাচ্চাটিও বাঁচে নি। আমার স্ত্রীর নাম ছিল আনুশকা। মৃত শিশুরও না-কি নাম প্রয়োজন হয়। কাজেই আমি আমার মৃত কন্যাটিরও নাম রেখেছিলাম। ওর নাম দিয়েছিলাম ছোট আনুশকা। ও তার মায়ের মতোই হয়েছিল। হয়তবা সে তার মায়ের চেয়েও সুন্দর হয়েছিল।

তৌহিদ মৃদুস্বরে বলল,এই অপ্রিয় প্রসঙ্গটা বাদ থাক ভাই সাহেব।

আচ্ছা বাদ থাক। চলুন আমরা আনন্দ করি। খুকী তোমার নাম কি?

আমার নাম বলতে ইচ্ছা করছে না।

তুমি কি গান জান খুকী?

আমার নাম অনি।

তুমি কি গান জান অনি?

জানি, কিন্তু গাইব না। আমার অবশ্যি একটা গান শোনার খুব ইচ্ছা করছিল।

অনি খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে যেন নিজের মনেই গাইছে এমন ভঙ্গিতে গান শুরু করল, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে..

কচিকণ্ঠের গান। যে গানের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক করছে সমুদ্রের মতো বড় সুরকার, সেই গান তো অপূর্ব হবেই। সবার মন অন্যরকম হয়ে গেল। ড্রাইভার পর্যন্ত দুবার পেছনে ফিরে গায়িকাকে দেখল। তৌহিদ মুগ্ধ। তার মেয়ে এত সুন্দর গাইতে পারে তা সে কল্পনাও করে নি। কোত্থেকে সে গান শিখল?

জলপ্রপাত দেখে রিমি মুগ্ধ। সে ভেবেছিল দেখবে ছোট্ট জলের ধারা। দেখা গেল তা নয়, প্রবল বেগে পানি নেমে আসছে। জামাল হোসেন বললেন, বর্ষাকাল বলে এত পানি। আসলে এত পানি থাকে না।

অনি বলল, আমি আপনার কোলে উঠব।

অবশ্যই উঠবে। এস।

ভদ্রলোক অনিকে ঘাড়ে তুলে নিলেন। হাসিমুখে বললেন, শিশুদের অনেক অসাধারণ ক্ষমতার একটা হল সব কিছু নিজের করে নেয়া। যখন সে একটা গাড়িতে চড়বে তখন বলবে এটা আমাদের গাড়ি। যখন ট্রেনে চড়বে; বলবে আমাদের ট্রেন। এখন অনি আমার ঘাড়ে চড়ে মনে-মনে বলছে আমাদের মানুষ। হা-হা-হা। তৌহিদ সাহেব আপনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন কেন ছবি তুলুন।

তৌহিদ লজ্জিত মুখে বলল, আমাদের কোন ক্যামেরা নেই।

আগে জানলে আমারটা নিয়ে আসতাম। ওটা ফেলে এসেছি সার্কিট হাউসে আমার স্ত্রীর কাছে। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমি আবার বিয়ে করি। উচিত ছিল দেবদাস হয়ে যাওয়া, সেটা সম্ভব হয় নি।

রিমি জিজ্ঞেস করবে না করবে না করেও জিজ্ঞেস করে ফেলল, উনাকে নিয়ে আসেন না কেন?

ওর সমুদ্র ভালো লাগে না। ও প্রায়ই আসে কক্সবাজার। বেশিরভাগ সময় রেস্ট হউসে শুয়ে থাকে। বার্মিজ মার্কেটে শপিং করে। আপনাদের হয়তবা ধারণা হচ্ছে ও একটু অন্যরকম। আসলে তা না, ও চমৎকার একটি মেয়ে। আপনাদের সঙ্গে কথা হলেই বুঝবেন। আসুন জলপ্রপাতে স্নান করা যাক। অবশ্যি এটাকে জলপ্রপাত না বলে ঝরনা বলাই যুক্তিযুক্ত।

আমরা তো গোসলের কাপড় আনি নি।

ভেজা কাপড়ে ফিরব। কোনো অসুবিধা নেই। আসুন।

সবাই পানিতে নেমে গেল। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় বর্ষণ। প্রচণ্ড বর্ষণ। বৃষ্টির পানি বরফের চেয়েও শীতল। সুচের মতো গায়ে ফুটছে। সবাই দৌড়ে গাড়িতে চলে এল।

সমুদ্র ফুঁসতে শুরু করেছে। বাতাসের সঙ্গে-সঙ্গে একেকটা ঢেউ লাফিয়ে উঠছে – অনেক দূর। জামাল সাহেব বললেন, অবস্থা খুব ভালো মনে হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া ভালো।

অনি খুব সহজ গলায় বলল, চাচা আজ কি আমরা সবাই মারা যাব?

তোমার কী মনে হয়?

আমার মনে হয় মারা যাব।

অনিকে আসন্ন মৃত্যুচিন্তায় মোটও চিন্তিত মনে হল না। তাকে বরং উল্লসিতই মনে হল।

৮. চার নম্বর বিপদ-সংকেত

চার নম্বর বিপদ-সংকেত দিয়েছে।

মাছ ধরার ট্রলারগুলোকে ফিরে আসার জরুরি বার্তা দেয়া হচ্ছে।

সমুদ্র সৈকতে বিপদ-সংকেতজ্ঞাপন লাল পতাকা উড়ছে। ছোট্ট সমুদ্র-শহর ঢেকে আছে অন্ধকারে। দমকা বাতাসে কয়েক জায়গায় বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে গেছে। – কিছুক্ষণ প্রবল বৃষ্টিপাতের পর ঝড়ো বাতাসে বৃষ্টি থেমে যাচ্ছে। থমথমে একটা অবস্থার সৃষ্ট হচ্ছে। আকাশে এক ধরনের অশুভ লাল আলো।

সার্কিট হাউস অন্ধকারে ডুবে আছে। ঘরে-ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। মোমতাবির আলোয় সবকিছু কেমন অন্যরকম লাগছে। অনির ফুর্তির সীমা নেই। সে একটু পরপর বলছে, আমাদের খুব মজা হচ্ছে, তাই না মা?

রিমি বলল, হ্যাঁ হচ্ছে।

ঝড় আমাদের সবাইকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, তাই না?

হ্যাঁ নেবে।

সমুদ্রের কাছে এলে এত মজা হয় কেন মা?

জানি না। এখন যাও তো তোমার বাবাকে গিয়ে বিরক্ত কর।

বড়রা এত বিরক্ত হয় কেন মা?

তাও জানি না।

এমন কেউ কি আছে যে সব প্রশ্নের উত্তর জানে?

উফ্‌ চুপ কর তো।

তৌহিদ বিষণ্ণ মুখে বসে আছে। তার প্রধান সমস্যা সিগারেট ফুরিয়েছে। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে সিগারেট কেনার জন্যে কাউকে পাঠানোর প্রশ্ন ওঠে না। এই দীর্ঘ রজনী সিগারেট ছাড়া চলবে কীভাবে? এই মুহূর্তেই তার সিগারেট দরকার। একটা ছাতা জোগাড় হলে নিজেই বের হত। ছাতা সে পাবে কোথায়?

এখন অবশ্যি বৃষ্টি হচ্ছে না। বের হলে মন্দ হয় না। তৌহিদ শার্ট গায়ে দিতে-দিতে বলল, রিমি আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, এক্ষুনি এসে পড়ব।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, রিমি কিছুই বলল না। তৌহিদ নিচু স্বরে বলল, এখন বৃষ্টি হচ্ছে না। আবার শুরু হবার আগে-আগে চলে আসতে হবে।

রিমি বলল, যাচ্ছ যখন একটা মশারি কিনে এন। কাল রাতে অনিকে মশা কামড়েছে। এদের মশারি নেই।

ওষুধ তো আছে। ওষুধ স্প্রে করে দিক।

দরকার নেই, ওষুধের গন্ধে তোমার আবার শ্বাসকষ্ট শুরু হবে। মশারির সঙ্গে মনে করে সুতলিও কিবে আর একটা টর্চ। টাকা আছে তোমার কাছে?

আছে।

তৌহিদ ঘর থেকে বেরুবার পর কিছুক্ষণের মধ্যে আবার বৃষ্টি শুরু হল। সেই সঙ্গে দমকা বাতাস। অনি খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল বাবাকে কি বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেছে?

বড় বিরক্ত করছ অনি।

তুমিও বিরক্ত করছ মা।

যাও তো চুপচাপ শুয়ে থাক।

অনি রাগ করে তার বিছানায় শুয়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ল।

রিমি এখন একা।

প্রায়ান্ধকার ঘর। বাইরে ঝড়বৃষ্টির মাতামাতি। এর মধ্যে একা সময় কাটানোর আলাদা আনন্দ আছে। রিমি মনে-মনে ভাবল, তৌহিদ দেরি করে ফিরলে ভালো হয়। সে কিছু সময় একা থাকতে পারে। একা থাকার আনন্দ সে ভুলেই গেছে। বিয়ে হবার আগে একা থাকতে ইচ্ছা করলে ছাদে যেত। বর্তমানে বাড়ির ছাদে যাবার উপায় নেই। বাড়িওয়ালা

সব সময় ছাদে তালা দিয়ে রাখে। একবার চাবির জন্যে জিতু মিয়াকে পাঠিয়েছিল। বলেছে চাবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাথরুমে গোসলের সময়টা অবশ্য তার নিজের। রিমি দীর্ঘ সময় ধরে গায়ে পানি ঢালতে পছন্দ করে। তারও উপায় নেই। অনি এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকবে, মা, ও মা। দরজা খোল মা।

পুরোপুরি নিঃসঙ্গ হবার কোনো ব্যবস্থা থাকলে ভালো হত। একটা ঘর থাকবে, যার দরজা বন্ধ করা মাত্র ঘরের আলো নিভে যাবে। বাইরের কোনো শব্দ সেই ঘরে ঢুকবে না।

রিমি ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল।

আর ঠিক তখন দরজার কড়া নাড়ল।

তৌহিদ কি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে?

রিমি দরজা খুলে একজন অপরিচিত ভদ্রমহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। মহিলা খুব মিষ্টি গলায় বললেন, আমি আপনাদের পাশের ঘরে থাকি। আমার স্বামীর সঙ্গে বোধ হয় আপনাদের পরিচয় হয়েছে জামাল হোসেন। আমার নাম রোকেয়া।

রিমি বলল, আসুন।

ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, ও আজ দুপুরে আপনাদের অনেক গল্প করল। কাল আমরা চলে যাচ্ছি-ভাবলাম দেখা করে যাই।

খুব ভালো করেছেন। আমি যদি তুমি করে বলি তাহলে রাগ করবে? আমি বয়সে তোমার অনেক বড়। আমার বড় মেয়ে কলেজে পড়ে।

অবশ্যই আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন। বসুন। খাটে পা তুলে বসুন।

তোমার হাসবেন্ড কোথায়?

ও কোথায় জানি গেছে। কাঁচুমাচু মুখ করে বাইরে যেতে চাইল। বোধহয় সিগারেট আনতে গেছে।

মনে হচ্ছে খুব কঠিন শাসনে রাখছ। ঐ বুঝি তোমাদের মেয়ে?

জ্বি।

খুব না-কি ছটফটে মেয়ে? অনবরত কথা বলে?

রিমি হাসিমুখে বলল, ও আসলে খুব লাজুক। এখানে এসে যে কী হয়েছে, সারাক্ষণ কথা বলছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, মুখে-মুখে কথা বলতে পারে এ রকম মেয়ে আমার খুব পছন্দ। আমার নিজের মেয়েটার মুখে কোনো কথা নেই। সমস্ত দিনে ছটা সাতটার বেশি শব্দ বলে কি-না সন্দেহ।

আপনার মেয়ের নাম কি?

মুনিয়া। খুব আশা ছিল মুনিয়া পাখির মত সারাক্ষণ কিচির-মিচির করবে। মেয়ে এ রকম হবে জানলে এর নাম রাখতাম উটপাখি। উটপাখি কোনো সাড়াশব্দ করে না।

ভদ্রমহিলা শব্দ করে হাসলেন।

রিমির মনে হল, মানুষে-মানুষে কত তফাৎ হয়। কত বড় অফিসারের স্ত্রী অথচ কী সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার।

রিমি বলল, আপনাদের খুব মজা, দেশে-বিদেশে ঘুরেঘুরে বেড়ান।

তোমাদের বুঝি খুব বেড়াতে ইচ্ছা করে?

হ্যাঁ।

খুব ভালো ইচ্ছা বেড়াবে। বেড়ানোর মানেই যে দিল্লি-আজমির যেতে হবে তা তো না— তুমি যদি রিকশা করে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে যাও, গাছগুলোর দিকে তাকাও; সেটাও বেড়ানো। তাই না?

রিমি ভদ্রমহিলার সঙ্গে একমত হল না। তবু হা-সূচক মাথা নাড়ল। ভদ্রমহিলা বললেন, আমার বেড়াতে যে খুব ভাল লাগে তা না। বেনোর চেয়ে ভ্রমণকাহিনী পড়তে আমার ভালো লাগে। তবে জামাল অন্যরকম। সমুদ্র ওর খুব পছন্দ। এই যে বৃষ্টি হচ্ছে; ও বসে আছে সমুদ্রের পাশে।

রিমি বিস্মিত হয়ে বলল, সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি। সমুদ্র ওর কেন পছন্দ জান?

না।

ওর প্রথম স্ত্রী সমুদ্রের জন্যে পাগল ছিল। একবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমুদ্রের পাশে থেকে সান-বার্ন হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ওর শখ ছিল সমুদ্রের উপর যেখানে যত লেখা আছে জোগাড় করা। সে নিজেও সমুদ্র-বন্দনা নামে দীর্ঘ একটা রচনা শুরু করেছিল।

আশ্চর্য তো!

আশ্চর্যের কিছু নেই। প্রাণের প্রথম সৃষ্টি হয় সমুদ্রে। কাজেই বলা যেতে পারে আমরা উঠে এসেছি সমুদ্র থেকে। সমুদ্র হচ্ছে আমাদের আদি মাতা। আমাদের চোখের জল নোনতা, আমাদের রক্ত নোনতা, আমাদের রক্তে যে ঘনত্ব; সমুদ্রের পানিরও সেই একই ঘনত্ব। সমুদ্রের প্রতি আমরা এক ধরনের আকর্ষণ তো অনুভব করবই। আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ সেই আকর্ষণ তীব্রভাবে অনুভব করে।

আপনি খুব গুছিয়ে কথা বলেন।

আমি গুছিয়ে কথা বলি, কারণ আমি একটা কলেজে পড়াই। কথা বলা হচ্ছে। আমার পেশা।

দমকা বাতাসে মোমবাতি নিভে গেল। রিমি বাতি জ্বালানোর জন্যে উঠে যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা বললেন, উঠতে হবে না। তুমি বস। অন্ধকারই ভালো।

রিমি বলল, আপনার চিন্তা লাগছে না?

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, চিন্তা লাগবে কেন?

উনি একা-একা সমুদ্রের কাছে আছেন।

ও তো ছেলেমানুষ নয়। ও যা করবে বুঝেশুনেই করবে।

যদি সমুদ্রে নামেন? নিশ্চয়ই খুব বড়-বড় ঢেউ উঠছে।

সমুদ্রে নামবে না। ও কখনো সমুদ্রে নামে না। আনুশকা যখন ছিল তখন তাকে নিয়ে নামত। সেই স্মৃতি ধরে রাখতে চায় বোধহয়। কিংবা হয়ত ওর সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল ওকে ছাড়া কখনো সমুদ্রেনামবে না। নববিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীরামজারমজার চুক্তি করে। কেউ-কেউ সেসব মনে রাখে। কেউ-কেউ রাখে না। আমি অবশ্য কখনো জিজ্ঞেস করি নি। জিজ্ঞেস করতে ভালো লাগে না।

তাঁর গলার স্বর কোমল। কিছুটা হয়ত আর্দ্র। তিনি কিছুক্ষণ চপ করে থেকে বললেন, তোমার হয়ত ধারণা হচ্ছে আমি প্রচুর বকবক করি। তাই না?

আমার এমন কিছু মনে হচ্ছে না। আপনি গল্প করছেন, আমার শুনতে ভালো লাগছে।

আমি যে খুব গল্প করি তাও না। আমার স্বভাবও অনেকটা আমার মেয়ের মতোই। চুপচাপ নিজের মনে থাকি। বইটই পড়ি।

আপনি যে আমার সঙ্গে কথা বললেন তার জন্যে কি আপনার খারাপ লাগছে?

না খারাপ লাগছে না। ভালোই লাগছে। তবে কেন এত বললাম সেটা তোমাকে ব্যাখ্যা করি। ব্যাখ্যা না করলেও হয়, তবু করি। তুমি দেখতে অবিকল আনুশকার মতো। ও আমাকে বলেছিল, আমি বিশ্বাস করি নি। তোমাকে দেখে বিশ্বাস হয়েছে।

আপনি কি উনাকে দেখেছিলেন?

না দেখি নি। ওর ছবি দেখেছি। আমাদের বাসায় তার অনেক ছবি বাঁধানো আছে। একজন মানুষের সাথে অন্য একজন মানুষের চেহারায় মাঝেমাঝে কাকতালীয় কিছু মিল দেখা যায়। সে রকম মিল। এই মিল ওকে খুব এফেক্ট করেছে। তোমাদের নিয়ে ও আজ হিমছড়ি গিয়েছিল, তাই না?

উনি যাচ্ছিলেন, আমাদের দেখতে পেয়ে তুলে নিলেন।

ব্যাপারটা তা না কিন্তু। সি-বীচে তোমাদের দেখে সে গাড়ি যোগাড় করল। আমাকে সব বলেছে। তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা শুনে খুব বিব্রত বোধ করছ। তুমি পবিত্র ধরনের একটি মেয়ে। মানুষের বিচিত্র সব জটিলতার সঙ্গে তোমার হয়ত পরিচয় নেই। তোমাকে এসব জটিলতার সঙ্গে পরিচয় করানোও আমার উচিত হয় নি। তবু বলে ফেললাম। আমি

আসলে খুব দুঃখী মেয়ে। ঝড়বৃষ্টির রাতে মানুষের মন দ্রবীভূত হয়ে থাকে। মনের কঠিন খাঁচা আলগা হয়ে যায়। গোপন দুঃখ সব বের হয়ে আসে। আমার দুঃখের গোপন কিছু কথা তোমাকে বলে ফেললাম, কিছু মনে করো না।

আমি কিছুই মনে করি নি।

আনুশকা যেভাবে ওর হাত ধরে সমুদ্রে নামতো আমারও তত সেইভাবে সমুদ্রে নামতে ইচ্ছা হতে পারে। পারে না?

নিশ্চয়ই পারে।

তুমি বাতি জ্বালাও, আমি এখন উঠব।

আরেকটু বসুন।

না যাই। তুমি মোমবাতিটা জ্বালাও তো।

রিমি বাতি জ্বালাল।

তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদের মেয়েকে একটা উপহার দেই তুমি কি রাগ করবেঃ

রিমি বলর, কী যে বলেন। কেন রাগ করব?

আগে বল রাগ করবে না।

রাগ করব না।

তোমার মেয়ের জন্যে আমি একটা ক্যামেরা এনেছি। দেখতে মনে হয় খুব দামি, আসলে তেমন দামি নয়। তা ছাড়া জিনিসটা পুরানো। আমরা কিছুদিন ব্যবহার করেছি।

রিমি অস্বস্তি ভরা গলায় বলল, উনি ক্যামেরাটা দিতে বলেছেন তাই না?

হ্যাঁ। তুমি যদি না নাও, তাহলে ও কষ্ট পাবে।

আপনি উনাকে অসম্ভব ভালবাসেন?

তা বাসি। সবার ভালবাসা তো এক রকম নয়। আমি ভালবাসি আমার মতো করে। তুমি ভালবাসবে তোমার মতো করে। যাই, কেমন?

আপনারা কি কাল সকালেই চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ আমরা খুব ভোরে রওনা হব। তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না।

তৌহিদ ফিরল রাত দশটায়।

সে কাকজো হয়ে আছে। মশারি একটা কিনেছে, সেই মশারি ভিজে ঢোল। তার কেনা সিগারেট অবশ্যি রক্ষা পেয়েছে। পলিথিনের ব্যাগ দিয়ে মোড়া ছিল বলেই এই অসাধ্য

সাধন হয়েছে। তৌহিদ বিব্রত বোধ করছে। টর্চও কেনা হয়েছে। এতক্ষণ আলো দিচ্ছিল। কিন্তু সার্কিট হাউজের সিঁড়িতে পা দেয়া মাত্র টর্চের আলোও নিভে গেল। পানি চুইয়ে ভেতরে ঢুকে কিছু-একটা হয়েছে।

তৌহিদ অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছে। সবচে বড় ভয় রিমিকে নিয়ে। সে যে ভয়াবহ রকমের রাগারাগি করবে, এটা বলার জন্যে জ্যোতিষী হওয়া লাগে না। এতক্ষণ ধরে বাইরে, সে নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে। খুব অন্যায় হয়েছে। ঘর থেকে বের হওয়াটা ঠিক। হয় নি। কী হত সিগারেট না খেলে?

রিমি কিছুই বলল না। শুকনো টাওয়েল এগিয়ে দিয়ে সহজ স্বরে বলল, মাথা মুছে ফেল। তার গলার স্বরে রাগের কোনো আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্যি এটা ঝড়ের পূর্বলক্ষণও হতে পারে।

তৌহিদ ক্ষীণ স্বরে বলল, ঢাকার সঙ্গে এই জায়গার তফাৎ কি জান? ঢাকায় বৃষ্টি-বাদলায় রিকশা বেশি পাওয়া যায়। বেশি ভাড়ার লোভে সব রিকশাওয়ালা রিকশা বের করে ফেলে। এখানে আকাশ একটু অন্ধকার হলেই সব রিকশাওয়ালা রিকশা তুলে রেখে বাড়ি চলে যায়। খাবার দিয়ে গেছে রিমি?

হ্যাঁ।

অনি খেয়েছে?

হ্যাঁ।

তুমি বোধ হয় খাও নি। মোমবাতি তো শেষ হয়ে এল। আরো আছে, না এটাই সর্বশেষ?

আর একটা আছে। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে আস। খেতে বসে যাই। সব বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

তৌহিদ মনে-মনে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মনে হচ্ছে রিমি তেমন রাগ করে নি। অবশ্যি মুখের ভঙ্গি এখনো খানিকটা কঠিন।

আরো আগেই আসতাম। রাস্তা হারিয়ে ফেললাম। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না।

টর্চ তো কিনেছ দেখি।

টর্চের আলোয় কিছু বোঝা যায় না। ছোট্ট একটা জায়গায় আলো পড়ে। আজ কী খাবার দিয়েছে?

মুরগির গোশত আর রূপচান্দা মাছ। ভাজি আছে, ডাল আছে। অনেক খাবার।

খাবার ঠাণ্ডা হলেও তৌহিদ প্রচুর খেয়ে ফেলল। পয়সায় কেনা খাবার নষ্ট করা ঠিক না এই বলে প্লেটে খাবার তুলতে লাগল।

রান্নাটাও ভালো হয়েছে, তাই না রিমি?

হ্যাঁ।

ঝাল অবশ্যি বেশি দিয়েছে। ঝালটা মাকের জন্যে খারাপ তবে হার্টের জন্যে ভালো। বিশেষ করে কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচ থ্রম্বসিসের জন্যে একটা চমৎকার মেডিসিন। তুমি যদি ডেইলি একটা করে কাঁচামরিচ খাও; তোমার কোনদিন থ্রম্বসিস হবে না।

রিমি বলল, তুমি দেরি করে আসায় আমি রাগ করি নি। কাজেই আমাকে খুশি করার জন্যে শুধু-শুধু কথা বলতে হবে না।

তৌহিদের অস্বস্তির সীমা রইল না। তার অকারণে কথা বলার রহস্য রিমি ঠিকই ধরেছে।

আজ আর কার্পেট বিছানো হল না। ঠাণ্ডা পড়েছে। কম্বল গায়ে দিতে হবে। খাটেই বিছানা তৈরি হল। তৌহিদ বলল, তুমি বরং অনির সঙ্গে শোও। ও একা আছে। বিদ্যুৎ চমকালে ভয়-টয় পাবে।

ভয় পাবে না।

মোমবাতি নিভিয়ে রিমি ঘুমুতে এল। তৌহিদ বলল, তুমি কি জরুরি কিছু আমাকে বলবে?

হ্যাঁ। কী করে বুঝলে?

তুমি যেমন আমার মনের কথাটা ধরে ফেল, আমিও তোমারটা ধরতে পারি। সব সময় পারি না। মাঝে-মাঝে পারি। কী বলবে?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রিমি বলল, তুমি কি আমাকে ভালবাস?

অবশ্যিই বাসি।

না বাস না। আমাকে তুমি ভয় পাও। ভালবাস না।

যাকে ভয় পাওয়া যায় তাকে বুঝি ভালবাসা যায় না?

হয়ত যায়; তবে আমার জন্যে তোমার মনে কোনো ভালবাসা নেই।

এমন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার কখন করলে? আজ?

আবিষ্কার অনেক আগেই করেছি, আজ শুধু বললাম।

কী দেখে তুমি এমন সিদ্ধান্তে চলে এলে, সেটা আমাকে বল। আমি তোমাকে নিয়ে কোনো কবিতা লিখি নি বা রং-তুলি দিয়ে তোমার ছবি আঁকার চেষ্টা করি নি। তার কারণ তোমার প্রতি আমার ভালবাসা নেই তা কিন্তু না, তার কারণ আমি কবিতা লিখতে পারি না। ছবিও আঁকতে জানি না।

রিমি হালকা গলায় বলল, আবিষ্কার কখন করলাম জান?

কখন?

ফরহাদ ভাইয়ের ব্যাপারটা জানার পরও তুমি যখন চুপ করে রইলে, কোনোরকম কৌতূহল দেখালে না তখন বুঝলাম আমার প্রতি তোমার কোনো আগ্রহ নেই। আমি অতীতে কী করেছি না করেছি তাতে তোমার কিছুই যায়-আসে না।

তৌহিদ শান্ত গলায় বলল, ব্যাপারটা সেরকম নয় রিমি। তখন তোমার বয়স ছিল নিতান্তই অল্প। অল্প বয়সে একটা ভুল করেছ...

ভুল করেছি বলছ কেন? এমনও তো হতে পারে ঐ দিন যা করেছিলাম ঠিকই করেছিলাম। বল, হতে পারে না?

হ্যাঁ পারে। হতে পারে।

ফরহাদ ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারত, পারত না? না?

হ্যাঁ পারত।

আজ আমার যে সংসার আছেতাঁকে নিয়েও এম্নি একটা সংসার নিশ্চয়ই হতে পারত। আজ যেমন তোমাকে নিয়ে সমুদ্রের কাছে এসেছি, তখন তাঁকে নিয়ে আসতাম। তুমি আমার হাত ধরে আমাকে সমুদ্রমানে নিয়ে যাও নি। তিনি হয়ত যেতেন। কাজেই তাঁর সাথে পালিয়ে গিয়ে ভুল করেছি আর তোমাকে বিয়ে করে শুদ্ধ কাজটা করা হয়েছে এটা বলছ কেন?

তৌহিদ কিছু বলল না। রিমি যে খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারে তা সে জানে। বিশেষ করে সে যখন রেগে যায় তখন খুব যুক্তি দিয়ে কথা বলে। এমনভাবে কথা বলে যে প্রতিটি বাক্য বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে।

তৌহিদ ঠিক করল সে একটি কথাও বলবে না। চুপ করে থাকবে। কথার পিঠে কথা না বললেই উৎসাহ হারিয়ে রিমি চুপ করে যাবে।

রিমি চুপ করল না। সে কথা বলে যেতে থাকল আপন মনে। কাউকে শোনাবার জন্যে নয়, যেন সে নিজেকেই শোনাতে চায়। রিমির গলার স্বর নিচু কিন্তু সে প্রতিটি বাক্য খুব স্পষ্ট করে উচ্চারণ করছে। রিমি বলছে, তোমার সঙ্গে বিয়ে হবার আগে একজন ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল। ঐ ডাক্তার এফআরসিএস করতে বিলেত যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হলে আমিও বিলেত যেতাম, আমার অন্য একটা জীবন। হত। সেই জীবনটাও নিশ্চয়ই ভুল হত না?

এই আলোচনা থাক।

না থাকবে কেন? আমার অনেক কথা বলার আছে; আমি সেগুলি তোমাকে বলতে চাই। একজন আমি মেজরের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল। তিনি প্রমোশন পেয়ে এতদিনে নিশ্চয়ই ব্রিগেডিয়ার-ফ্রিগেডিয়ার হয়েছেন। আর তুমি এগার বছর মাস্টারি করার পর এ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার হয়েছে। তাও এ্যাকটিং পোষ্টে।

আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে এই কারণে তুমি কি মনে-মনে কষ্ট পাও?

হ্যাঁ পাই। আমি কখন স্কুল মাস্টার বিয়ে করতে চাই নি।

কী আর করবে বল, তোমার দুর্ভাগ্য।

দুর্ভাগ্য তো বটেই। উঠে যাচ্ছ কোথায়?

একটা সিগারেট খাব।

কেন, মাথা জাম হয়ে গেছে?

তৌহিদ উত্তর দিল না। বিছানা থেকে নেমে সিগারেট ধরাল। দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বৃষ্টি থেমে গেছে। তবে এখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সমুদ্র এখান থেকে অনেক দূরে। তবু সমুদ্রের হুমহম ক্রুদ্ধ গর্জন কানে আসছে। রিমিও তৌহিদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে কান্না-কান্না গলায় বলল, আমার ভাগ্য আসলেই খারাপ।

তৌহিদ বলল, আমারও মনে হয় তোমার খুব ভালো একটা বিয়ে হতে পারত। ভালোভালো সব সম্পর্ক ভেঙে গিয়ে আমার মতো একজন অপদার্থের সঙ্গে তোমার বিয়ে হল এটাই আশ্চর্য।

কেন হল জান? হল কারণ তোমার মতো খোজখবর না নিয়ে কেউ বিয়ে করে। না। যাদের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছে তারাই খোঁজখবর করেছে। যখন জানতে পেরেছে আমি একটা ছেলের সঙ্গে একবার পালিয়ে গিয়েছিলাম তখনি পিছিয়ে গেছে। অবশ্যি ঐ মেজর সাহেব

আমাকে দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তারপরও তিনি রাজি ছিলেন। বিয়ের দিন-তারিখও হয়ে গিয়েছিল।

তাহলে বিয়েটা হল না কেন?

হল না কারণ মেজর সাহেব একটা উড়ো চিঠি পেলেন। ঐ উড়ো চিঠিতে লেখা ছিল— আমি যে শুধু পালিয়ে গিয়েছিলাম তাই না, গৌরীপুরের একটা হোটেলে রাতও কাটিয়েছিলাম। হোটেলটার নাম শান্তি বোর্ডিং। তোমরা এরকম কোনো উড়ো চিঠি পাও নি?

না।

যদি পেতে হলে কি বিয়ে ভেঙে দিতে?

তোমার কী হয়েছে বল তো রিমি। আমি দেরি করে ফেরায় তুমি যদি রাগ করে থাক তাহলে হাতজোড় করে ক্ষমা চাচ্ছি। এস আমরা ঘুমুতে যাই। সকালে ঘুম ভাঙলে মন শান্ত হবে।

আমার মন শান্তই আছে। তোমার মনও শান্ত। তোমার শান্ত মনকে একটু শুধু অশান্ত করব। গল্পটা পুরোপুরি বলব। আজই শুধু বলব। আর কোনোদিন বলব না। বস, চেয়ারটায় বস। আমার দিকে তাকাও।

তাকালেও তো তোমাকে দেখতে পারছি না। বারান্দা অন্ধকার।

অন্ধকার হলেও তাকাও।

তৌহিদ তাকাল। রিমি কথা শুরু করল, ওর সঙ্গে আমি রওনা হলাম ভোরবেলা। ট্রেনে করে। গৌরীপুর স্টেশনে আমরা নামলাম। উনি আমাকে লেডিজ ওয়েটিং রুমে বসিয়ে চা আনতে গেলেন। আমি বসে আছি, হঠাৎ মেজো চাচা সেখানে ঢুকে অবাক হয়ে বললেন, তুই এখানে কোথায় যাচ্ছি, কার সঙ্গে যাচ্ছি? আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কী বলব ভেবে পেলাম না। মেজো চাচা বললেন, কি রে, তার বাবা-মা কোথায়? কার সঙ্গে এসেছিস? আমি বললাম, মার সঙ্গে নেত্র চাচা বললেন, তোর মা কোথায়? আমি বললাম, চাচা আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি মাকে ডেকে আনছি। মা কলে হাত ধুতে গেছে। বলেই ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। ঘর থেকে বের হয়েই ফরহাদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। দুজনে ছুটলাম ওভার ব্রিজের দিকে। মেজো চাচা আমাদের আর খুঁজে পেলেন না।

একরাত আমরা কাটালাম গৌরীপুরের সেই হোটলে। পরদিন সেই হোটেল থেকে আমাকে উদ্ধার করা হয়। মেজো চাচা ছিলেন, থানার ওসি ছিলেন, আরো অনেকেই ছিল—এই হচ্ছে আমার গল্প।

তৌহিদ বলল, রিমি, এই গল্প আমি জানি।

তুমি জান।

হ্যাঁ জানি। বিয়ের পর শুনেছি শান্তি বোর্ডিং-এর দোতলায় ছয় নম্বর ঘরে তোমরা ছিলে। তোমাদেরভাবভঙ্গি দেখে বোর্ডিং-এর ম্যানেজারের সন্দেহ হয়। সেই পুলিশে খবর দেয়। তুমি ঐ বোর্ডিং-এ পা দেয়ার পর থেকেই খুব কান্নাকাটি শুরু করেছিলে।

রিমি বলল, তুমি ছাড়া এই ঘটনা আর কে জানে? তোমার মা জানেন?

হ্যাঁ জানেন।

তিনি শুনে কী বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন, ও বাচ্চা একটা মেয়ে। এরা অনেক ভুল করে। সে একটা ভুল, করেছে— তুই ক্ষমা করে দে।

রিমি শব্দ করে হাসল। তৌহিদ কঠিন গলায় বলল, হাসছ কেন? মা কি কোনো হাসির কথা বলেছিলেন?

অবশ্যই। তিনি বলেছিলেন গা বাঁচানো কথা। তোমার মা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা। তিনি পরিবারের স্ক্যান্ডেল প্রচার হোক তা চান নি। তুমিও চাও নি। তুমি চাও নি কারণ তুমি হচ্ছ মেরুদণ্ডহীন একজন স্কুল মাস্টার। তোমার কিল খেয়ে কিল হজম করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। তুমি খুব ভালো করেই জানতে একটি বউকে বিদেয় করে দিলে দ্বিতীয় একজনকে জোগাড় করা তোমার জন্যে শক্ত। তারচে এই তো ভালো। সুন্দরী একটি মেয়েমানুষ হাতের কাছে আছে। ঘরের কাজকর্ম করছে। রাতে শারীরিক প্রয়োজনেও তাকে পাওয়া যাচ্ছে। তৌহিদ নিচু গলায় বলল, তুমি একটা জিনিস ভুলে যাম্ রিমি। আমি খুবই তুচ্ছ এবং নগণ্য একজন মানুষ তা ঠিক, কিন্তু তুচ্ছ নগণ্য একজন মানুষের হৃদয়ও তো বড় হতে পারে।

বড় হৃদয়ের কথা আমাকে বলবে না। বড় হৃদয়, বড় মহৎ এইসব খুবই বাজে কথা। তুমি হচ্ছ গা-বাঁচানো মানুষ। তোমার কি মনে আছে, তোমাকে নিয়ে নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম? প্রচণ্ড ভিড়ের সুযোগে একটা লোক আমার বুকে হাত দিল।

তোমার মনে আছে?

আছে।

তুমি দেখেও না দেখার ভান করলে। এটা করলে কেন? তোমার হৃদয় বড় বলে? না, তা কিন্তু না। তুমি গা বাঁচাতে চাইলে। ঝামেলা এড়াতে চাইলে। তুমি যা চাও তা হচ্ছে কোনো ঝামেলা, কোনো যন্ত্রণা ছাড়া জীবনটা পার করে দিতে। স্ত্রীকে সামান্য ভালবাসলে যদি ঝামেলা কমে তাহলে সেই সামান্য ভালবাসাও তুমি দিতে প্রস্তুত আছ। আমার কথা শেষ হয়েছে, চল ঘুমুতে যাই।

চল।

আরেকটা শেষ কথা শুধু—এরপর থেকে আমি কিন্তু আর কোন দিন তোমার সঙ্গে শোব না। কোনদিন আমার গায়ে হাত দিতে পারবে না। আমার যাবার জায়গা নেই; কাজেই আমাকে থাকতে হবে তোমার সঙ্গে। কিন্তু আমি আবার পড়াশোনা করব। আবার বি.এ. পরীক্ষা দেব। অবশ্যই পাস করব। তারপর একটা চাকরি খুজে তোমাকে ছেড়ে চলে যাব।

তোমার যা ইচ্ছা তাই করবে। আমি বাধা দেব না।

তা দেবে না। বাধা দিলেই ঝামেলা। তুমি চাও ঝামেলাহীন একটা জীবন। রিমি এসে অনির পাশে শুয়ে পড়ল। তার কপালের শিরা দপদপ করছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। সে ধরেই নিয়েছে আজ সারারাত তার ঘুম হবে না। অথচ কী আশ্চর্য, বিছানায় শুয়ে গভীর ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। শেষরাতের দিকে সে জোবেদা খানমকে স্বপ্নে দেখল।

বৃদ্ধা মহিলা খুব করুণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন, তার চেয়েও করুণ গলায় বলছেন, বৌমা, তুমি শুধু-শুধু খোকার ওপর রাগ করছ। ও একবার আমাদের নেত্রকোনার বাসার পেছনের পুকুরে ডুবে গিয়েছিল। তারপর থেকে পানি খুব ভয় পায়। তুমি তো এই খবর জান। তারপরও কেন রাগ কর? পানি ভয় পায় বলেই তোমাকে নিয়ে সমুদ্রে নামে না।

আমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।

তুমি মাথা ঘামাচ্ছ। তুমি আমার খোকার কাছে যাও। ওর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

রিমির ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্নের কোনো মানে হয় না। স্বপ্ন স্বল্পই। তবু এই স্বপ্নে কী যেন আছে। স্বপ্ন হয়েও এটা যেন স্বপ্ন না।

তৌহিদ পানি অসম্ভব ভয় পায় এটা সে জানে। সমুদ্রের কাছে আসার উত্তেজনায় ভুলে গিয়েছিল। অবচেতন মন তা মনে করিয়ে দিয়েছে। এর বেশি কিছু না। শ্বাসকষ্টের কথাটা ঠিক না। শ্বাসকষ্ট হলে তৌহিদ তাকে ডাকত।

রিমি উঠে বসল। ইলেকট্রিসিটি এখনো আসে নি। সে হাতড়ে-হাতড়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে তৌহিদের কাছে এগিয়ে গেল।

তৌহিদ জেগে আছে।

তার মুখ হাঁ হয়ে আছে। তার কপালে ঘাম। অসম্ভব যন্ত্রণায় ঠোঁট নীল হয়ে যাচ্ছে। চোখ ঘলাটে। রিমি রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, তোমার এত কষ্ট, কেন তুমি আমাকে ডাকলে না? কেন ডাকলে না?

ফিসফিস করে, যেন অতি দূরের কোনো জায়গা থেকে তৌহিদ বলল, রিমি, আমি মরে যাচ্ছি।

না তুমি মরছ না। তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। ধর, তুমি আমার হাত ধর।

অনিকে দেখব। আমি অনিকে একটু দেখব।

তোমার কাউকে দেখতে হবে না। তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। এই দেখ আমি তোমার হাত ধরে আছি।

নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

পারবে। নিঃশ্বাস নিতে পারবে। কতক্ষণ ধরে এমন হচ্ছে?

অনেকক্ষণ।

কেন তুমি আমাকে ডাক নি?

নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

রিমি জানালা খুলে দিল। পর্দা সরিয়ে দিল। তার শরীর থরথর করে কাঁপছে। বাতাস আসুক। প্রচুর বাতাস। সমুদ্রের টাটকা হাওয়া এই ঘরের বদ্ধ বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাক। রিমি কাঁপছে। সে নিজেও বুঝতে পারছে না যে তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি ঝরছে।

রিমি।

বল।

এক গ্লাস পানি দাও, যন্ত্রণাটা একটু কমেছে।

রিমি পানি গ্লাসে ঢেকে এনে দেখে তৌহিদ ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড কষ্টের পর একটু কষ্টটা কমলেই চোখে ঘুম আসে। রিমি মোমবাতি নিভিয়ে বারান্দায় এসে চোখ মুছল। ভোর হচ্ছে। পাখি ডাকছে। একজন দুজন রওনা হচ্ছে সমুদ্রের দিকে।

পাশের ঘরের দরজা খুলে জামাল সাহেব বের হয়ে এলেন। রিমির দিকে চোখ পড়তেই সে বলল, স্লামালিকুম।

জামাল সাহেব বললেন, আজ খুব ভোরে উঠেছেন মনে হচ্ছে।

জ্বি, আপনারা আজ চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আর কখনো আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না?

জামাল সাহেব হাসিমুখে বললেন, হতেও পারে। আবার যদি কখনো সমুদ্রের পাশে আসেন তাহলে দেখা হবে। আমি প্রায়ই আসি।

রিমি চাপা গলায় বলল, আমি আর কখনো সমুদ্রে আসব না। কখনো না।

জামাল সাহেব সহজ গলায় বললেন, আনুশকা প্রতিবার এই কথা বলত। আবার আসত। আপনিও আসবেন।

জামাল সাহেবের স্ত্রী বের হয়ে এলেন। রিমিকে দেখে বললেন, তোমার কর্তা এবং কন্যা দুজনেই ঘুমুচ্ছে?

জ্বি।

কাল তোমার কর্তাকে দেখলাম কাকভেজা হয়ে ফিরছে। জ্বর হয় নি তো?

জ্বি না। শরীর একটু খারাপ হয়েছিল। এখন ভালো, ঘুমুচ্ছে।

তাহলে তুমি চল আমাদের সঙ্গে। শেষবারের মতো সমুদ্র দেখে আসি।

রিমি কয়েক মুহূর্ত ভাবল, তারপর বলল, চলুন। এক সেকেন্ড দাঁড়ান, আমি স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে আসি।

ঝড়ের পর শান্ত সমুদ্র।

কী নীল, কী নীল।

আকাশে-সমুদ্রে মাখামাখি হয়ে আছে। কোথায় সমুদ্রের শেষ, কোথায় আকাশের শুরু- বোঝাই যায় না। মনে হয় আকাশ সমুদ্রমেশা।

তারা তিনজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে। রিমি বলল, আমি কখনো সমুদ্রে নামি নি।

জামাল সাহেবের স্ত্রী বললেন, কেন বল তো?

একা-একা নামতে ভয় লাগে। ও কখনো নামবে না। ওর পানির খুব ভয়। ও একবার পানিতে ডুবে গিয়েছিল।

ভদ্রমহিলা বললেন, জামাল, তুমি ওর হাত ধরে ওকে একট সমদ্রে নিয়ে যাও।

জামাল সাহেব বিস্মিত চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। ভদ্রমহিলা কিছু বলার আগেই রিমি তার হাত বাড়িয়ে দিল। সেই হাত বাড়ানোর মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই, কোনো সংকোচ নেই।

জামাল সাহেব রিমির হাত ধরে এগিয়ে গেলেন। রিমি এগুচ্ছে নিঃসংকোচে। তার দৃষ্টি সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের জল তাদের দুজনের হাঁটু পর্যন্ত আসামাত্র রিমি বলল, আপনি কি আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

বিস্মিত জামাল সাহেব বললেন, নিশ্চয়ই রাখব।

আপনি কি কথা দিচ্ছেন?

জামাল সাহেব হাসিমুখে বললেন, পৃথিবীর তিনভাগ যে সমুদ্র ঢেকে রেখেছে তার মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষ যা বলে তাকে তা করতে হয়।

রিমি শান্ত স্বরে বলল, তাহলে আপনি আপনার স্ত্রীকে ডেকে আনুন। উনার খুব শখ আপনার হাত ধরে সমুদ্রে স্নান করবেন।

আমাকে তো ও কখনো বলে নি।

আমি দাঁড়াচ্ছি, আপনি উনাকে নিয়ে আসুন।

জামাল এগিয়ে যাচ্ছে। রিমি একা দাড়িয়ে আছে।

হঠাৎ তার কী যে হল—সে এগিয়ে যেতে থাকল সমুদ্রের দিকে। বড়-বড় ঢেউ আসছে। সে গ্রাহ্যই করল না।

জামাল সাহেব এবং তার স্ত্রী দুজনই ছুটে তার কাছে আসতে চেষ্টা করছে। বড়বড় ঢেউ ভেঙে পড়ছে। তারা কেউ এগুতে পারছে না। জামাল সাহেব প্রচণ্ড ধমক দিলেন, এইসব কী পাগলামি হচ্ছে? এই মেয়ে, তুমি কি আমাদের দুজনকে মারতে চাও?

প্রচণ্ড একটা ঢেউ এসে প্রবল বেগে রিমির গায়ে আছড়ে পড়ল। এই ঢেউ রিমিকে তীরে ছুঁড়ে ফেলতে পারে। আবার কোন এক অদ্ভুত কৌশলে নিজের কাছে টেনেও নিতে পারে। সে কী করবে, কে জানে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র